প্রদর্শন

লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসব ১৪২২

সম্পাদক : রবীন্দ্র গোপ

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রতিবেদন

লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসব ১৪২২

সম্পাদক : রবীন্দ্র গোপ

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসব ১৪২২ প্রতিবেদন
Folk Art & Crafts Fair and Folk Festival 2015 Report

সম্পাদনা পরিষদ
মোঃ রবিউল ইসলাম
একেএম মুজ্জাম্মিল হক

প্রচ্ছদ শিল্পী
রবীন্দ্র গোপ
একেএম আজাদ সরকার

আলোকচিত্র শিল্পী
মোঃ শফিকুর রহমান

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
প্রকাশকাল : আষাঢ় ১৪২২, জুন ২০১৫

মুদ্রণ
জি. জি. অফসেট প্রেস
৩১/এ সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেন
নয়াবাজার ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১১৭৫১৫, ০১৭১১৬০২৪৪২

মূল্য : ২০০.০০ টাকা মাত্র

ISBN : 978-984-33-9319-7

Folk Art & Crafts Fair and Folk Festival 2015 Report. Edited by Rabindra Gope, Director, Bangladesh Folk Art & Crafts Foundation. Published by Bangladesh Folk Art & Crafts Foundation. Sonargaon, Narayanganj, Bangladesh. First Edition : June 2015, Price Tk. 200.00 Phone : (+88 02) 7656331, 7656309, Email : director.s.museum@gmail.com, Web : www.fms.gov.bd

উৎসর্গ

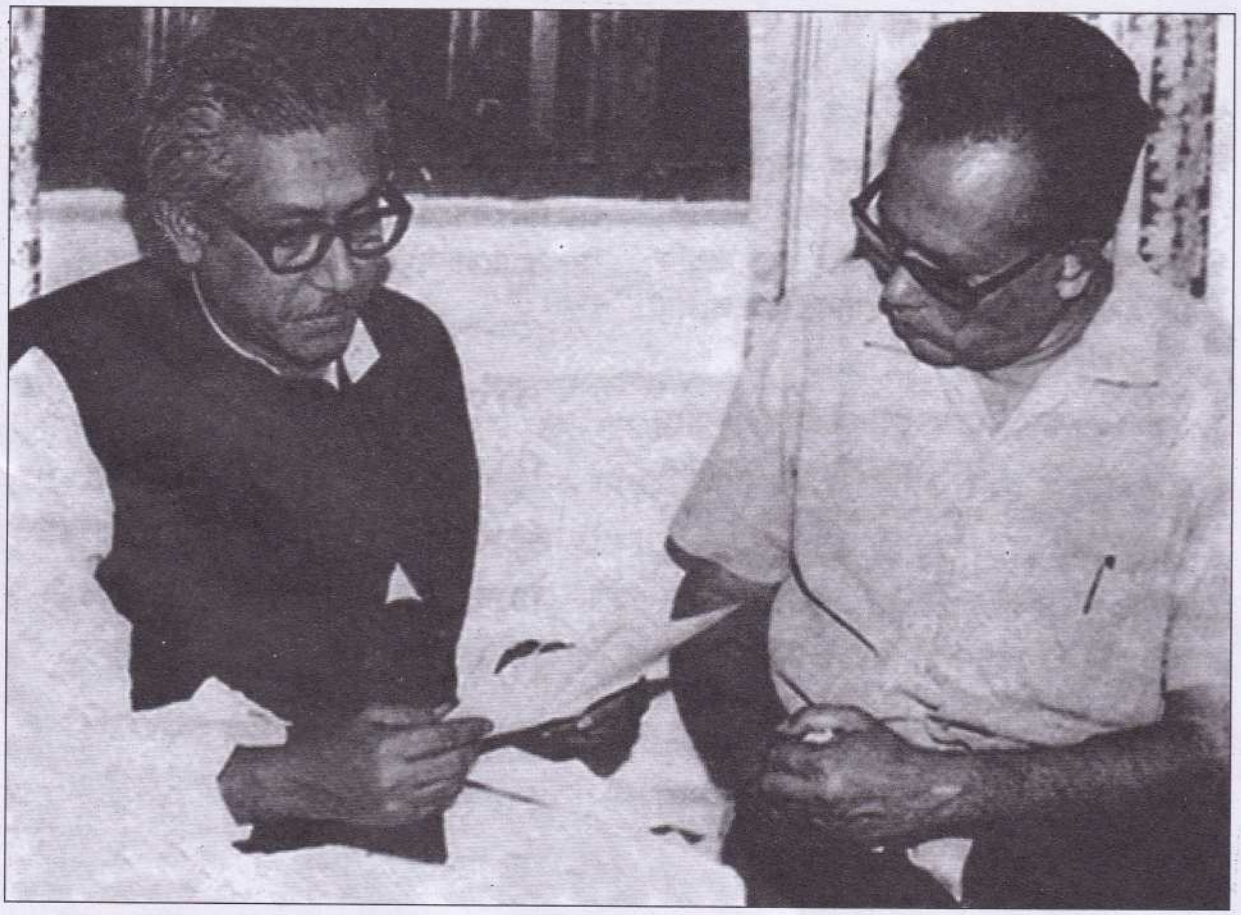

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
তাঁর প্রথম আর্থিক সাহায্য, পরামর্শ ও পৃষ্ঠপোষকতায় এবং
শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৭৫ সালের ১২ মার্চ
একটি প্রজ্ঞাপন বলে সরকার বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে।

সামান্য নিবেদন

সোনারগাঁও বাংলাদেশের হাজার বছরের প্রাচীন প্রাচুর্যময় ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির এক গৌরবোজ্জ্বল প্রাচীন জনপদ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরামর্শ ও অর্থ-সাহায্যে এবং এ দেশের মাটি ও মানুষের শিল্পী শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৭৫ সালের ১২ মার্চ একটি প্রজ্ঞাপন বলে সরকার বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে। ইতোমধ্যে এ প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘ ৪০ বছর সাফল্যের সাথে অতিক্রম করেছে।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা স্থাপন করেন শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর। ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প আইন মহান জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হয় এবং ৬ মে ১৯৯৮ তারিখের গেজেটে তা প্রকাশিত হয়। ২০০১ সালে সোনারগাঁয়ে কারুশিল্পগ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পের কাজও আওয়ামী লীগ সরকারের সময়েই সম্পন্ন হয়।

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার পুনর্বার ক্ষমতায় এসে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের ভৌত অবকাঠামো ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এ প্রকল্পের আওতায় ফাউন্ডেশনের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, 'বনছায়া' অফিসার্স কোয়ার্টার ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, ছায়ানীড় স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ, গাড়ি পার্কিং ময়দান নির্মাণ, কারুপল-ী এলাকা উন্নয়ন, প্রধান গেইট নির্মাণ, টিকিট কাউন্টার কাম গার্ড হাউস নির্মাণ, মিউজিয়াম ও প্রশাসনিক ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, অভ্যন্তরীণ আলোকিত করণ কাজ, পাবলিক টয়লেট নির্মাণ, ফাইবার গ-াসের প্যাডেল বোট, ভিডিও স্টিল ক্যামেরা ও ইমারজেন্সি জেনারেটর ক্রয়, কারুপল-ীতে ৪৮টি সেমিপাকা স্টল নির্মাণ, ময়ূরপঙ্ক্ষী নৌকার আদলে 'সোনারতরী' মঞ্চ নির্মাণ, আরসিসি ব্রিজ নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণসহ আসবাসপত্র এবং জাদুঘর নিদর্শন সংগ্রহ করা হয়েছে।

ফাউন্ডেশনের প্রশাসনিক ভবনের সম্মুখের পুষ্পিত বাগানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণদানের আদলে পিতলের তৈরি সুউচ্চ ভাস্কর্য নির্মাণ করা হয়েছে। এটি সোনারগাঁও এলাকার জনগণের জন্য সর্বোপরি বাঙালি জাতির জন্য গৌরবের বিষয়। ফাউন্ডেশন দেশীয় ঐতিহ্যের পাশাপাশি পর্যটকদের কাছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্যের স্মারক চিহ্ন যুগ যুগ ধরে বাঙালির গৌরবগাঁথা তুলে ধরতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

ফাউন্ডেশন চত্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শহীদ শেখ রাসেল-এর ভাস্কর্য নির্মাণ করা হয়েছে। এখানে ইতোমধ্যে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের একটি আবক্ষ ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছে। ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ৩৮ বছর পর ২০১২ সালে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা, কর্মচারিগণের জন্য অবসরকালীন পেনশন ভাতা প্রবর্তনও করেছে বর্তমান সরকার।

এছাড়া সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রজাতন্ত্রী দক্ষিণ কোরিয়ার ইয়াংওয়ান কর্পোরেশনের মধ্যে ফাউন্ডেশনের লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর-বড় সরদারবাড়ির রেস্টোরেশন কাজের ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। আলোচ্য রেস্টোরেশন কাজ সমাপ্তির পর্যায়ে রয়েছে। সামাজিক দায়িত্বপূর্ণ দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে বাংলাদেশে এককভাবে সবচেয়ে বড় বিদেশি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কোরিয়া ভিত্তিক বহুজাতিক কোম্পানি অনুদান হিসেবে ইয়াংওয়ান করপোরেশনের চেয়ারম্যান ও কেইপিজেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মি.কিহাক সাং ঐতিহাসিক

বড়সরদার বাড়ি যথাযথ বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণ করার মাধ্যমে এর রাজসিকতা ফিরিয়ে আনতে অনন্য উদ্যোগ নিয়েছেন। যা এদেশের মানুষের ঐতিহ্য, আভিজাত্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরবে। আলোচিত রেস্টোরেশন প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে এর ভৌত অবকাঠামো ফিরিয়ে আনার পর এ ভবনের সম্মুখভাগে রাজকীয় জীবনধারাকে জীবন্ত করে তোলা হবে। আর এ বাড়ির পেছনের অংশে লোক ও কারুশিল্প জাদুঘরে রূপান্তরিত করা হবে। অনিন্দ্যসুন্দর অলঙ্করণশৈলীতে সুশোভিত বড় সরদারবাড়ির জৌলুস পুনরায় পর্যটকগণ অবলোকন করতে পারবেন।

প্রতিবছর উপমহাদেশের এই দর্শনীয় স্থান সোনারগাঁ পরিভ্রমণে আসেন প্রায় দশ লক্ষ দেশি-বিদেশি পর্যটক। অদূর ভবিষ্যতে ফাউন্ডেশনটির আরো সৌন্দর্য বর্ধন এবং সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনের পাশাপাশি গবেষণায় নিয়োজিত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। তিন দশক ধরে এ প্রতিষ্ঠানটির গবেষণা-প্রকাশনা শাখা তেমন কোন কাজ করেনি। এমন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি ফাউন্ডেশনে পরিচালক হিসেবে যোগদান করার পর থেকে বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে পর্যালোচনা করে সোনারগাঁও পরিদর্শনে আগত ভ্রমণপিপাসু ও ঐতিহ্যপ্রেমী অনুসন্ধিৎসু পর্যটকের জন্য গাইড বই প্রকাশ করি এবং ফাউন্ডেশনের পরিচিতি তুলে ধরে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এটি পরিদর্শনের জন্য নিমন্ত্রণ জানাই। ফাউন্ডেশনের নিয়মিত প্রকাশনার পাশাপাশি আলোচিত সময়ে লোকশিল্পের নির্বাচিত প্রবন্ধ, বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র, বাংলাদেশের কারুশিল্পী ও শিল্পকর্ম শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা ও গবেষণার মান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আরো গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশের নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

লোকশিল্পের বিকাশ ও প্রসারে প্রতিবছর ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে মাসব্যাপী লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসবের বর্ণিল আয়োজন করা হয়। এ ধরনের উৎসব সাম্প্রদায়িকতা, কূপমুণ্ডকতা, কুসংস্কার এবং জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ করে বাঙালি জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখবে যা আমাদেরকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিবে।

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন তাৎপর্যের দিক থেকে বাংলাদেশেরই ক্ষুদ্রাকার অবয়ব বলা চলে। এখানে রূপসী বাংলাদেশের অপরূপ প্রতিচ্ছবি প্রত্যক্ষ করা যায়। এ ফাউন্ডেশন প্রতিনিধিত্ব করছে হাজার বছরের লোকমানুষের পরম্পরাগত সভ্যতা ও সংস্কৃতির। ঐতিহ্যের ক্রমপুঞ্জিত ধারায় আয়োজিত ফাউন্ডেশনের মাসব্যাপী লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসব এখন একটি প্রতিষ্ঠিত মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে। লোকজ ঐতিহ্যকে অকৃত্রিমভাবে উপস্থাপন করা আর নতুন প্রজন্মের কাছে এর পরিচিতি তুলে ধরতে ফাউন্ডেশনের মাসব্যাপী লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসবের সমারোহপূর্ণ আয়োজন।

মাসব্যাপী লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ব্যাপক পণ্যসামগ্রীর সমারোহ ঘটে। লোক ও কারুশিল্পকে উৎসাহিত ও উজ্জীবিত করার প্রয়াসে এবারের মেলায় দেশের প্রত্যন্ত এলাকার কারুশিল্পীরা স্বাচ্ছন্দে তাদের পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছেন। নিঃসন্দেহে এতে কারুশিল্পের বাজার সম্প্রসারিত হয়েছে। ফাউন্ডেশনের মাসব্যাপী এই দীর্ঘ আয়োজনে গ্রাম-বাংলার চিরায়তরূপ তুলে ধরা হয়। প্রতিদিন দেশি-বিদেশি হাজার হাজার পর্যটক ফাউন্ডেশনের এই বৃহৎ আয়োজন পরিদর্শনে আসেন।

বাঙালির গর্ব ও গৌরবের লোকজ ঐতিহ্যের অনন্য উপাদানের পুনরুজ্জীবনে মাসব্যাপী লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৫ আয়োজনে যারা সহায়তা দিয়েছেন, বিশেষ করে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি, মাননীয় সংসদ-সদস্য জনাব লিয়াকত হোসেন খোকা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব, নারায়ণগঞ্জ-০৩ আসনের সাবেক সংসদ-সদস্য জনাব আব্দুল্লাহ্-আল-কায়সার,

নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসন, সোনারগাঁ উপজেলা প্রশাসন, সোনারগাঁও পৌরসভা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় জনসাধারণ এর অগ্রগতি ও সফল আয়োজনে সহযোগিতা করেছেন, তাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। এছাড়া বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ৬০ হাজর দর্শনার্থী বর্ণাঢ্য বর্ষবরণের আনন্দযজ্ঞ উপভোগ করেন। এ উপলক্ষে তিনদিনব্যাপী বসে গ্রামীণ লোকমেলা। বছরে প্রায় ১০ লক্ষ পর্যটক সোনারগাঁও জাদুঘর পরিদর্শন করে।

মাসব্যাপী লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৫ এর তথ্যাবলী আলোচিত প্রতিবেদনের মূল প্রতিপাদ্য। তবে এর সাথে প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে দেশবরেণ্য ব্যক্তিত্ব ভাষাসংগ্রামী, বিশিষ্ট রবীন্দ্রগবেষক জনাব আহমদ রফিক রচিত *রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ভাবনা ও কর্ম-সাফল্য* রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের অধ্যাপক ড. সাইফুদ্দীন চৌধুরী রচিত তাম্রশাসনে আবহমানকালের বালাদেশ বাংলা একাডেমির সহকারী পরিচালক জনাব সাইমন জাকারিয়া রচিত *চর্যা-সংস্কৃতির আলোকে বুদ্ধ নাটকের ঐতিহ্য অন্বেষণ* এবং বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের গাইড লেকচারার জনাব একেএম মুজ্জাম্মিল হক রচিত *নবসাজে প্রাচীন রাজধানীর ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ি* শীর্ষক নিবন্ধ আলোচ্য প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

মাসব্যাপী লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৫ সুষ্ঠু ও সার্থকভাবে আয়োজন শেষে এই প্রতিবেদন প্রকাশে যারা আন্তরিক সহযোগিতা, শ্রম, মেধা ও পরামর্শ দিয়েছেন আমার পক্ষ থেকে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই।

আমার প্রীতিমুগ্ধ বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ আমার পাশে থেকে মাসব্যাপী লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসবের সমারোহপূর্ণ আয়োজনে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তা অবশ্যই মনে রাখার মত। মেলা পরিদর্শন করুন, সমৃদ্ধময় লোক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হোন। আগ্রহী পাঠকের কাছে ফাউন্ডেশনের মাসব্যাপী লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসব ১৪২২ বঙ্গাব্দের তথ্যাবলী সম্বলিত প্রতিবেদনটি সমাদৃত হবে বলে আশা রাখি। সত্য সুন্দরের জয় হোক ।

রবীন্দ্র গোপ
পরিচালক
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সূ চি

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ভাবনা ও কর্ম-সাফল্য ১১
আহমদ রফিক

তাম্রশাসনে আবহমানকালের বাংলাদেশ ১৬
ড. সাইফুদ্দীন চৌধুরী

চর্যা-সংস্কৃতির আলোকে বুদ্ধ নাটকের ঐতিহ্য অন্বেষণ ২০
সাইমন জাকারিয়া

নবসাজে প্রাচীন রাজধানীর ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ি ৩১
একেএম মুজ্জাম্মিল হক

একনজরে লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৫ ৩৬

আলোকচিত্র : স্মৃতির পাতা থেকে ৫৩

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ভাবনা ও কর্ম-সাফল্য

আহমদ রফিক

নাগরিক কবি রবীন্দ্রনাথ পিতার নির্দেশে জমিদারি দেখাশোনার জন্য প্রথমে শিলাইদহ (নভেম্বর ১৮৮৯) পরে ক্রমান্বয়ে শাজাদপুর (জানুয়ারি, ১৮৯০) ও পতিসরে আসেন (জানুয়ারি, ১৮৯১)। গ্রাম বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেমন তাকে মুগ্ধ করে তেমনি বিচলিত করে গ্রামীণ জীবনের দুঃসহ দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য ইত্যাদি। এ দুই দিক থেকেই চিত্তে নয়া উপলব্ধির রেখাপাত। শুরু হয় ভিন্নধারার সাহিত্য সৃষ্টি–কবিতা, গল্প, নাটক, পত্রাবলী ও প্রবন্ধাদি। সেই সঙ্গে দরিদ্র জনশ্রেণির অবস্থা পরিবর্তনের ভাবনা, ক্রমে পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নের সংকল্প। 'মানুষের সম্পর্শেই' যে এই দুই পথে বিচরণ সে কথা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় (১৮৯৩)।

অভিজ্ঞতা তাকে বুঝতে সাহায্য করে যে আর্থিক বিবেচনায় দরিদ্র মানুষগুলোর মধ্যে উপস্থিত সরলতা এক মহৎ গুণ। তাই লেখেন : 'সরলতা মানুষের স্বাস্থ্যের একমাত্র উপায়... যতক্ষণ না সভ্যতার মাঝখানে এই স্বচ্ছ সরলতার প্রতিষ্ঠা হয় ততক্ষণ সভ্যতা কখনোই সম্পূর্ণ ও সুন্দর হবে না' (ছিন্নপত্রাবলী, ১৮৯৩)। এ কথা পরেও বলেছেন, যেমন ঢাকায় কার্জন হলে 'দ্যরুল অব জায়ান্ট' বক্তৃতায় (১৯২৬)।

'বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসে' রবীন্দ্রনাথের শিল্পীচেতনায় ও মানবিক চেতনায় গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে সাহিত্য সৃষ্টিতে যেমন আনন্দ তেমনি আনন্দ দুঃস্থ মানুষের জন্য পল্লীউন্নয়ন ও পল্লী পুনর্গঠন কর্মকাণ্ডে। দীর্ঘসময় পর এক বক্তৃতায় বলেন 'পল্লীর প্রতি যে একটা আনন্দময় আকর্ষণ আমার যৌবনের মুখে জাগ্রত হয়েছিল আজও তা যায়নি' (বাকুঁড়া, ১৯৪০)। এমন উপলব্ধি থেকেই লিখেছেন 'আমরা চাষ করি আনন্দে' অথবা 'ফিরে চল মাটির টানের মতো গানের পঙ্‌ক্তি।

দুই

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ ও পতিসরে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড শুরু করেন রথীন্দ্রনাথের মতে ১৯০০ সালে (পিতৃস্মৃতি)। তবে চিঠিপত্রাদির সূত্রে দেখা যায় পরীক্ষামূলকভাবে শিলাইদহে এ কাজ শুরু আরো কয়েক বছর আগে। বিজ্ঞানী বন্ধু জগদীশচন্দ্রকে ১৮৮৯ সনে লিখেছিলেন : 'আমার চাষবাসের কাজ মন্দ চলিতেছে না' (চিঠিপত্র-৬)। তবে গ্রামোন্নয়ন ও পল্লী পুনর্গঠনের তাত্ত্বিক চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে 'স্বদেশী সমাজ' (১৯০৪), 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' (১৯০৫)'র মতো প্রবন্ধে এবং এর পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশ পেয়েছে পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ 'অভিভাষণে' (১৯০৮)। এর আগে (১৯০৫) একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য : 'দেশের কর্মশক্তিকে একটি কর্তৃসভার মধ্যে বদ্ধ করিতে হইবে। অন্তত একজন হিন্দু ও একজন মুসলমানকে এই সভার অধিনায়ক করিব' (অবস্থা ও ব্যবস্থা)। গ্রামীণ কর্মকাণ্ডেও হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় সঠিক গুরুত্বে উপস্থিত ছিল।

ঐ অভিভাষণে তরুণদের আহ্বান জানিয়ে বলেন : 'তোমরা যে পারো এবং যেখানে পারো এক-একটি গ্রামের ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে গিয়া আশ্রয় লও। গ্রামগুলিকে ব্যবস্থাবদ্ধ করো' (১৯০৮)। গ্রামে গ্রামে কৃষির উন্নয়ন, কুটিরশিল্প স্থাপন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য-পূর্তকার্যাদির জন্য ১৫ দফা কর্মসূচির প্রস্তাব রাখেন রবীন্দ্রনাথ। লক্ষ্য পল্লী পুনর্গঠনের আদর্শ মডেল তৈরি। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, গ্রাম বাঁচলে দেশ বাঁচবে। কিন্তু রাজনৈতিক নেতাদের চেষ্টা করেও তার পথে

আনতে পারেননি। তাই নিজেই সীতিত পরিসরে শিলাইদহ-পতিসরে কাজ শুরু করেন। গ্রামোন্নয়নের ঐ আহ্বান যে এখনো কত প্রাসঙ্গিক তার প্রমাণ ৮০-র দশকেও বাংলাদেশে শ্লোগান : 'আটষট্টি হাজার গ্রাম বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে।'

প্রসঙ্গত এক চিঠিতে অজিত চক্রবর্তীকে লেখেন : 'আমি গ্রামে গ্রামে যথার্থ স্বরাজ স্থাপন করতে চাই–সমস্ত দেশে যা হওয়া উচিত তারই ছোট প্রতিকৃতি... রথীকে আমি এই কাজেই লাগাব' (সূত্র : প্রশান্তকুমার পাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড)। তাই পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও বন্ধুপুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে আমেরিকায় পাঠান কৃষিবিদ্যা ও গোষ্ঠবিদ্যায় প্রশিক্ষণ নিতে যাতে ফিরে এসে তারা পল্লীউন্নয়ন কাজে সাহায্য করতে পারে এবং ঠিকই আমেরিকা ফেরৎ এ দুজন গ্রামোন্নয়নের কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন।

স্বনির্ভর পল্লীসমাজ গঠনের কর্মচিন্তায় রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিল জনমনে আত্মশক্তির উদ্বোধন (আত্মশক্তি প্রবন্ধমালা দ্র.) ও গ্রামের জনশক্তিকে উন্নয়নকাজে সক্রিয় করে তোলা, নির্বাচিত সংগঠনের (যেমন হিতৈষী সঙ্ঘ) মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মকাণ্ড পরিচালনা, জীবিকা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সমবায়নীতির প্রয়োগ, ক্ষুদ্রঋণ সহায়তায় গ্রামীণ জনতার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষা এবং জনহিতকর কাজের মাধ্যমে স্বনির্ভর গ্রাম ও সুস্থ আধুনিক চেতনার মানুষ তৈরি করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো। এ কাজে রবীন্দ্রনাথ 'জোটবাঁধা, ব্যূহবদ্ধতা ও অর্গ্যানিজেশন'-এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সেই সঙ্গে তার ইচ্ছা 'শিক্ষিত সমাজের কর্মপ্রচেষ্টা গণসমাজে প্রসারিত করে' গ্রাম-নগরের ঐক্য গড়ে তোলা। গ্রাম থেকে নগর, নগর থেকে গ্রামের পারস্পরিকতা। দেবে ও নেবে। যেমন গ্রাম থেকে কৃষি ও শিল্পপণ্য, শহর থেকে শিক্ষা-সংস্কৃতি ইত্যাদি।

এ লক্ষ্যে তার মূল চিন্তা-প্রাচীন কালের সমাজ-প্রাধান্যের আদর্শে আধুনিক চরিত্রের পল্লীসমাজ-প্রধান দেশ গড়ে তোলা যেখানে শহর-গ্রামের বৈষম্য কম থাকবে। এমন ভাবনা থেকে তিনি লিখেছেন 'চিরদিন ভারতবর্ষে ও চীনদেশে সমাজতন্ত্রই প্রবল, রাষ্ট্রতন্ত্র তার নীচে। দেশ যথার্থভাবে আত্মরক্ষা করে এসেছে সমাজের সম্মিলিত শক্তিকে। সমাজপ্রধান দেশের প্রাণ সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে থাকে' (রবীন্দ্ররচনাবলী ২৪, বিশ্বভারতী)। বিষয়টি নিয়ে এককালের অর্থবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে, বিশেষ করে আধুনিককালে রাষ্ট্র ও সমাজের সম্পর্ক নিয়ে। কারণ আধুনিক রাষ্ট্রের দায়িত্ব ব্যক্তি ও সমাজের সুষ্ঠু দেখভাল করা। রবীন্দ্রনাথের গ্রাম-সমাজ ভাবনাকে সামগ্রিক তথা রাষ্ট্রিক প্রেক্ষাপটে 'ইউটোপীয়' মনে করে থাকেন উল্লিখিত কেউ কেউ।

কিন্তু এ কথা সত্য যে সীমিত পরিসরে রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়ন কর্ম পতিসরে সফল হয়েছিল। তার লক্ষ্য ছিল গ্রামে গ্রামে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা নিশ্চিত করা, আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষির উন্নতি, কুটিরশিল্পের বিকাশ ঘটানো এবং বিকল্প বা উদবৃত্ত আয়ের ব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর গ্রাম গড়ে তোলা। সেই সঙ্গে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পূর্তকর্ম ইত্যাদির মাধ্যমে আদর্শ পল্লীগঠন। কারণ তিনি দেখেছেন 'পল্লীবাসীরা আছে সুদূর মধ্যযুগে, আর নগরবাসীরা বিংশ শতাব্দীতে' (পল্লীপ্রকৃতি)। তাই অন্বিষ্ট পল্লীপুনর্গঠন ও স্বনির্ভর আধুনিক পল্লীসমাজ গঠনের মাধমে বহু উচ্চারিত স্বরাজের ভিৎ তৈরি করা।

তিন

সেই সঙ্গে তার বিশেষ লক্ষ্য ছিল যথাযথ শিক্ষাদানের মাধ্যমে গ্রামবাসীর মানসিক উন্নতি ঘটানো। সেই সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নিশ্চয়তা বিধান। ঢাকায় ছাত্র-জনতার উদ্দেশ্যে এই সমাজ ভাবনার কথাই বলেন বেশ কিছুকাল পরে (১৯২৬)। মৃত্যুর বছর কয় আগেও বলেছেন, 'শ্রেষ্ঠত্বের উৎকর্ষে সকল মানুষের সমান অধিকার। গ্রামে গ্রামে মানুষকে সেই অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। সকলের চেয়ে বড়ো দরকার শিক্ষার সাম্য' (পল্লীপ্রকৃতি)। এক কথায় তার পূর্বাপর

লক্ষ্য গ্রামবাসীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক উন্নয়ন এবং গ্রাম-নগরের বৈষম্য হ্রাস করা, গ্রাম যাতে 'শহরের উচ্ছিষ্টভোজী না হয়'।

কিভাবে, কোন্ পরিকল্পনা ও পদ্ধতিতে পল্লীপুনর্গঠন সে প্রশ্নের জবাবে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ গ্রামোন্নয়নের মূলনীতি হিসেবে সমবায় ব্যবস্থার ওপর বিশ্বাসী। তার ভাষায় 'জীবিকা যদি সমবায়নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় তবে... গ্রামগুলি বেঁচে উঠবে ও সমস্ত দেশকে বাঁচাবে' (রচনাবলী, ২৭)। তার বিশ্বাস এতে করে সবাই মিলে বড়ো হবে, সমবায়ীদের মধ্যে গড়ে উঠবে মনের ঐক্য। সেই সঙ্গে তিনি চেয়েছেন বিজ্ঞানের সাহায্য ও যন্ত্রশক্তির ব্যবহার। এমন একটা ভুল ধারণা রয়েছে যে রবীন্দ্রনাথ যন্ত্রশক্তি ব্যবহারের বিরোধী ছিলেন, এমন ধারণা ঠিক নয়। মুক্তধারা নাটকের ভুল ব্যাখ্যা থেকে এমন ধারণার উদ্ভব।

তার কর্মপরিকল্পনায় পঞ্চায়েতি ধারার রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন সাংগঠনিকভাবে মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে ও হিতৈষী সভার তৎপরতায় গ্রামে গ্রামে 'পাঠশালা, শিল্পশিক্ষায়, ধর্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার ও ব্যাংক স্থাপন করা'। বাস্তবে তিনি বিরাহিমপুর পরগণাকে পাঁচটি মণ্ডলীতে এবং কালিগ্রাম পরগণাকে তিনটি বিভাগে সাংগঠনিকভাবে বিন্যস্ত করেন। বিন্যাসের ক্রমিকতা হলো গ্রাম-বিভাগ-কেন্দ্র। অর্থাৎ তৃণমূল স্তর থেকে ক্রমশ কেন্দ্রে উপস্থিত হওয়া। বিভিন্ন স্তরে নির্বাচিত হিতৈষী সভার মাধ্যমে কর্মপরিচালনা। সর্বোচ্চ তদারকিতে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ বা রথীন্দ্রনাথ। সহযোগিতায় রবীন্দ্রনাথের নিয়োজিত তরুণ শিক্ষিত কর্মীবাহিনী। প্রসঙ্গত কালিমোহন ঘোষ ও অতুল সেন প্রমুখ নেতৃস্থানীয় কর্মীর উদাহরণ স্মর্তব্য।

আমরা জানি বিশেষ কারণে রবীন্দ্রনাথ তার পল্লী উন্নয়ন কর্মকাণ্ড শিলাইদহ থেকে মুসলমান প্রধান কালিগ্রাম পরগণায় নিয়ে আসেন। কালিগ্রামে দেখা যায় হিতৈষী সভার উদ্যোগে গড়ে উঠেছে গ্রামে অবৈতনিক পাঠশালা, বিভাগে মধ্য ইংরেজি ও কেন্দ্রে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়। সেই সঙ্গে স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসাসেবা পাস করা ডাক্তার নিয়োগের মাধ্যমে। তাছাড়া জলাশয় খনন ও সংস্কার, রাস্তা নির্মাণ, জঙ্গল পরিষ্কার ইত্যাদি জনহিতকর কাজ। রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে গড়ে ওঠে 'কৃষি সমবায়', 'তাঁত সমবায়' ইত্যাদি। অর্থাৎ সমবায় প্রথার যথাযথ ব্যবহার।

কৃষির উন্নয়নে আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতির ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় ফুটে উঠেছে– যেমন উন্নতমানের বীজ ও সার ব্যবহার, ট্রাক্টরে চাষ ইত্যাদি। কিন্তু অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও খণ্ড খণ্ড জমি একত্র করে চাষ ও যৌথখামার ব্যবস্থা চালু করতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ মূলত কৃষকদের মানসিকতার কারণে। কৃষিখাতের পর গুরুত্ব আরোপ করা হয় কুটিরশিল্পের বিকাশে– যেমন তাঁতশিল্প, চামড়া ও মৃৎশিল্প, কলে আখমাড়াই ও ধানভানা, মাছের চাষ, দুগ্ধখামার, ছাতা তৈরি ইত্যাদি। কুষ্টিয়ায় স্থাপিত হয় বয়ন স্কুল, পরে কালিগ্রামে। উদ্দেশ্য গ্রামীণ অর্থনীতিতে কুটিরশিল্পের মাধ্যমে প্রাণসঞ্চার।

একই সঙ্গে পল্লী-উন্নয়নে রবীন্দ্রনাথের গুরুত্বপূর্ণ অবদান কৃষকসহ দরিদ্র গ্রামবাসীদের ক্ষুদ্রঋণ সহায়তার উদ্দেশ্যে কৃষিব্যাংক স্থাপন। একালে ঐ ঋণসহায়তা ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থা তথা 'মাইক্রোক্রেডিট সিস্টেম' নামে প্রশংসিত। রবীন্দ্রনাথের নয়া পল্লীসমাজ গঠনের পদ্ধতিগত তাৎপর্যপূর্ণ প্রকাশ যদি হয়ে থাকে গণতান্ত্রিক পঞ্চায়েতি তথা মণ্ডলী ব্যবস্থার কর্মকাণ্ডে তাহলে গ্রামীণ দারিদ্রমোচনে তার অসামান্য প্রচেষ্টার প্রকাশ পতিসরে কালিগ্রাম কৃষি ব্যাংক স্থাপনে (১৯০৫)। একালে ঐ ক্ষুদ্রঋণদান প্রকল্প নিয়ে রীতিমতো হৈ-চৈ চলছে শতবর্ষ পূর্বে যার সূচনা ঘটান রবীন্দ্রনাথ। ধারদেনা করে স্থাপিত এ ব্যাংকের ঋণে সুদের হার ছিল খুবই কম (১২%)। ব্যাংক কৃষকদের মধ্যে এতটা সাড়া জাগায় যে ব্যাংকের মূলধনে টান পড়ে। কবি তার নোবেল পুরস্কারের টাকা থেকে মোটা অংকের টাকা (১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা) কৃষি ব্যাংকে জমা রাখেন (১৯১৪)। পরে অন্যসূত্রে প্রাপ্ত কিছু টাকাও জমা দেন (১৯১৭)। এ ব্যাংকের কারণে কালিগ্রাম এলাকা মহাজন-মুক্ত হয়েছিল। প্রমাণ রাজশাহী গেজেটিয়ারে ও ম্যালির বক্তব্য। এর আগে ছোট আকারে শিলাইদহেও কৃষিব্যাংক স্থাপিত হয়

আর সাজাদপুরে অতি ছোট 'কর্জা তহবিল'। সবগুলোরই উদ্দেশ্য দরিদ্র জনশ্রেণিকে সাহায্য করা। কালিগ্রাম কৃষিব্যাংক চলে কুড়ি বছর (অমিতাভ চৌধুরী)। পরে এক সরকারি আইনে (রুরাল ইনডেটেডনেস অ্যাক্ট) কারণে ব্যাংক বন্ধ হয়ে যায় (পিতৃস্মৃতি)।

চার

অর্থনীতিবিদ বা সমাজবিজ্ঞানী না হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ গ্রামীণ দারিদ্র্য এবং তা মোচনের খুঁটিনাটি বিষয়ক চিন্তায় বাস্তববোধের পরিচয় রেখেছেন যার সুফল তার এলাকাবাসীরা পেয়েছে। তিনি লক্ষ্য করেছেন ও লিখেছেন যে গৃহস্তের প্রয়োজন ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। কিন্তু উৎপাদন বাড়ছে না, আয় বাড়ছে না। সে জন্য তিনি বিকল্প আয় বা উদবৃত্ত আয়ের জন্য বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবন করেছেন– যেমন বাস্তুবাড়িতে, ক্ষেতের আইলে ফলের চাষ, ফসল-শূন্য মাঠে বিকল্প ফসলের চাষ ইত্যাদি। কৃষকদের এসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন। আর কুটিরশিল্পের নানা দিক তো আছেই।

তিনি আরো লক্ষ করেছেন ভূস্বামী-মহাজনদের পাশাপাশি মধ্যস্বত্বভোগীদের শোষণ। লিখেছেন : 'সমাজের নিম্নস্তরে চাষী যাহা ফলাইতেছে, উপরিস্ত রের লোক নানাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া তাহাদের সেই ফসলের ভাগ লইতেছে, কৃষক ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছে না'। এ অবস্থা একালেও চলছে। এসব কারণেও রবীন্দ্রনাথ দরিদ্র কৃষক ও জনশ্রেণির দুর্দশা লাঘবের জন্য বিকল্প আয়ের সন্ধান করেছেন। এবং কিছুটা হলেও সফল হয়েছেন– বিশেষ করে কুটিরশিল্প ও জীবিকার বিভিন্ন পেশায়।

পাঁচ

লক্ষ্য করার বিষয় যে রবীন্দ্রনাথ তার সাহিত্যকর্মই নয় জনসেবা এবং গ্রামোন্নয়ন কর্মকাণ্ডও সৃজনশীলতার অংশ হিসাবে গণ্য করেছেন। নান্দনিক কর্ষণের মতো জাগতিক কর্ষণও ছিল তার জন্য আনন্দের। সুরুলে তার কর্মসহযোগী এল্‌মহার্স্টের বক্তব্যের জবাবে এসব কাজ তিনি চিহ্নিত করেছেন 'ওয়ার্ক অব ক্রিয়েশন' রূপে (১৯২৩)। এমন উপলব্ধি থেকেই লিখতে পেরেছেন গানের পঙ্‌ক্তি : আমরা চাষ করি আনন্দে। এলমহার্স্ট কথিত (পল্লীপুনর্গঠন' তার চোখে নবসৃষ্টি, যেমন পতিসরে তেমনি 'শ্রীনিকেতন'-এ।

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিপ্রেমী, সৌন্দর্যের ভোক্তা। যেমন শিল্পসৃষ্টিতে তেমনি জীবনের ক্ষেত্রেও। প্রকৃতির সান্নিধ্য তার প্রিয়। তিনি, 'প্রকৃতির দান এবং মানুষের জ্ঞান' দুটোই সহযোগীরূপে পেতে চান। প্রকৃতির দান ভূমি, জলস্রোত, বৃষ্টি, গাছপালা বন সবই মানবকল্যাণে ব্যবহারযোগ্য। দরকার জ্ঞান ও বিজ্ঞানপ্রযুক্তির মাধ্যমে সেসবের যথাযথ ব্যবহার। প্রকৃতিকে আঘাত নয়, দরকার প্রকৃতির সঙ্গে পরস্পর-নির্ভর সহাবস্থান। চেয়েছেন নান্দনিকতা ও বাস্তবতার সমন্বয়। তাহলেই মানবিক সভ্যতার উন্নয়ন, মানবিক চেতনার মুক্তি।

তাই যেমন সৌন্দর্যের টানে তেমনি মানবকল্যাণে রবীন্দ্রনাথ অরণ্যপ্রেমী, জলস্রোত তার প্রিয়। অরণ্যনির্মূলের ফলে ভূমিক্ষয়, অনাবৃষ্টি, সৌন্দর্যের ঘাটতি। ভূমিলক্ষ্মীকে রক্ষা করতে চাই বনলক্ষ্মীর সাহায্য (অরণ্যদানব)। এসব দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ সমন্বয়বাদী। ঢাকা থেকে ময়নসিংহ সফরে যেয়ে রবীন্দ্রনাথ তার বক্তৃতায় এ ধরনের কথাই বলেন (১৯২৬)। যেমন 'বর্ষণের স্নিগ্ধ আনন্দসম্ভোগই যথেষ্ট নয়। বর্ষণ কৃষককে ডাক দিয়ে বলে, বৃষ্টিকে কাজে লাগাতে হবে।' প্রাসঙ্গিকভাবে বলতে হয়, একালের 'পরিবেশ বাঁচাও' আন্দোলনেরও আদর্শিক প্রতিনিধি তিনি।

রবীন্দ্রচৈতন্য এভাবে নান্দনিকতার সঙ্গে জীবনবাদী বাস্তবতাও একই সঙ্গে ধারণ করে। সত্য, সুন্দর ও আনন্দের ভাববাদী ধারণায় যেমন রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসী তেমনি বিশ্বাসী ব্যক্তিসমাজ ও দেশসেবার মধ্য দিয়ে আনন্দের উপলব্ধিতে। জীবনচর্চার আনন্দ তিনি একই মূল্যে বিবেচনা করেন।

রবীন্দ্রাথের পল্লীভাবনা ও জীবন ভাবনা এবং শিল্পসৃষ্টি ও নয়াসমাজ সৃষ্টি মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। রোমান্টিকতা ও বাস্তবতার সহাবস্থান তার জীবনে ও কর্মে এক নিশ্চিত সত্য এ কথা অস্বীকার করা কঠিন। হয়তো তাই পল্লীপ্রকৃতির সৌন্দর্যের পাশাপাশি পল্লীসমাজের শোচনীয় দুর্দশাও তার সংবেদনশীল চিত্তের নজর এড়ায় না। তাই এ দুইয়ে তার সমান সংশ্লিষ্টতা, সমান উপভোগ্যতা। এখানেই রবীন্দ্রনাথের শিল্পবাদিতা ও জীবনবাদিতার মহৎ প্রকাশ, সমন্বিত প্রকাশ।

সংক্ষিপ্ত আলোচনার উপসংহারে বলা দরকার যে রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়ন ভাবনা ও পরিকল্পিত কর্মকাণ্ড একালের রাষ্ট্রিক কাঠামোতে কতোটা বাস্তব, কতোটা গ্রহণযোগ্য তা নিয়ে কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ বা সমাজবিজ্ঞানীর সমালোচনামূলক প্রশ্ন কম নয়। ঐসব প্রশ্নের বাস্তবতা মেনে নিয়েই অবশেষ বিচারে আমাদের প্রশ্ন : রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় অর্থাৎ উপনিবেশবাদী ইংরেজ শাসনামলে দেশের শোষিত জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি বা সামাজিক ধনের সুষম বন্টন ও শ্রেণিগত সুবিচার তখনকার রাষ্ট্রকাঠামোয় কি আদৌ সম্ভব ছিলো? সেই বাস্তবতার নিরিখেই রবীন্দ্রনাথের সমাজ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বিচারব্যাখ্যা করতে হবে। তখনকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডও হিসেবে আনতে হবে।

অন্যদিকে বিচার্য যে বিদেশি শাসনের অবসান সত্ত্বেও একালেও তা সম্ভব হয়নি। তখনকার স্বদেশী রাজনীতি যেমন এ বিষয়ে এগুতে পারেনি তেমনি দীর্ঘ স্বদেশী শাসনে ত্রিধাবিভক্ত স্বাধীন রাষ্ট্রের কোনোটিতেই এখনো সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তন, কৃষিখাতে উৎপাদন সম্পর্ক বা পদ্ধতির গুণগত পরিবর্তন বা গ্রাম-নগরের ধনবৈষম্য তথা শ্রেণিবৈষম্যের অবসান ঘটেনি। বরং রবীন্দ্রনাথ-সূচিত সমবায় নীতি, গ্রামীণ কুটিরশিল্পের বিকাশ এবং ক্ষুদ্রঋণ সহায়তার মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র জনতার একাংশে দারিদ্র্য বিমোচনের চেষ্টা চলছে যা এখনো প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত। এ সবই তো সংস্কারবাদী প্রচেষ্টা, আংশিক প্রচেষ্টা এবং তা সমগ্র গরিব জনগোষ্ঠীর জন্য নয়। কিন্তু ঘটনা বলে শতবর্ষেরও আগে রবীন্দ্রনাথ সীমিত পরিসরে গ্রামোন্নয়নে ও পল্লীদারিদ্র্য নিরসনে অনেকটাই সফল হয়েছিলেন। তাই তার উন্নয়ন ভাবনা ও কর্মের বাস্তবতা গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় আনতে হয়, অন্তত যতদিন না সমাজ বিপ্লবের পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে বা বৈপ্লবিক সমাজ পরিবর্তনের কাজ শুরু হচ্ছে।

আহমদ রফিক
ভাষাসংগ্রামী, রবীন্দ্রগবেষক

তাম্রশাসনে আবহমানকালের বাংলাদেশ

ড. সাইফুদ্দীন চৌধুরী

লোক ঐতিহ্য বস্তুত একটি মানবগোষ্ঠীর সৃষ্টি, যার দ্বারা একই ভৌগোলিক পরিবেশে বসবাস মানুষের জীবনচর্যার নানা অনুষঙ্গের পরিচয় মেলে। যেখানে পাওয়া যায় আচার-আচরণের কথা, ভাব-ভাষার কথা, জীবন-জীবিকার কথা।

লোক ঐতিহ্যের এই জীবন চর্যার একটা প্রাচীন পরিচয়ের সন্ধান মিলে প্রাচীন পরিচয়ের সন্ধান মিলে প্রাচীন মুদ্রা, ভাস্কর্য, মৃৎশিল্প, শিলালেখ, তাম্রশাসন বা তাম্রপট্টোলীর মতো নানা ঐতিহাসিক উপকরণের মধ্যে। এর মধ্যে আবার গুরুত্ব রয়েছে অভিলেখমালার-তাম্রশাসনসমূহে বা তাম্রপট্টোলীতে। ঐতিহাসিকগণ কেবল বাংলাদেশেরই নয়, সামগ্রিক অর্থে ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগের ইতিহাসের ক্ষেত্রে ঐ অভিলেখমালার অবদান অপরিসীম বলে উল্লেখ করেছেন। ইতিহাস পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে তাম্রশাসন বা তাম্রপট্টোলী যে গুরুত্ববহ তার কারণ, এতে রয়েছে যতটা শাসকদের কথা, তার চাইতে বেশি রয়েছে মধ্যবিত্তের কথা, নিম্নবিত্তের কথা; তথা সাধারণ মানুষের কথা। রাজা প্রদত্ত তাম্রপট্টোলীতে শাসনদাতার নামের সঙ্গে অধিকাংশ সময়ই ছোট বড় নানা কর্মচারির নাম, শাসন গ্রহীতার নাম ও বংশ পরিচয় পাওয়া যায়। তাম্রশাসনেই দেখা যায় গরিব ব্রাহ্মণেরা গুরুগৃহে শিক্ষা সমাপনের পর ধর্মরক্ষা এবং জীবন ধারণের জন্য রাজার নিকট থেকে ভূমিদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। রাজাও পুণ্যলাভের আশায় ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেছেন। এ থেকে ঐ সময়ে গ্রামের একটি চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রাচীন বাংলায় গ্রাম বিষয়ে ধারণা করা যায় পঞ্চম-ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে। এই সময়ে চট্ট, ভট্ট, বন্দ্য ইত্যাদি গ্রামনামে ব্রাহ্মণদের পরিচিত হতে দেখা যায়। গাঞ্জী বা গ্রাম-এর ব্যবহার এই সময়ই বস্তুত অর্থে অনেকটা বিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়। প্রথাসিদ্ধভাবে গাঞ্জী বা গ্রামের ব্যবহার শুরু হয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে। ভবদেব ভট্টোর মাতার পরিচয় চম্পাহিটী চম্পহট্টীয় ব্রাহ্মণ হিসেবে। এভাবে বাংলাদেশে প্রাপ্ত বিভিন্ন তাম্রশাসনে দিণ্ডী, পালি, সেউ, মাসচটক বা মাসচড়ক, মূল সেহন্দারী, পুতি, মহান্তিয়াড়া, করঞ্জ, তটক, মৎস্যবাস, ভট্টশালীয় পীতাম্বর, তৈলপাটীয় গাঙ্গোক, কেশোরকোলীয় নাথোক, বন্দিঘটীয়, সর্বানন্দ প্রভৃতি গাঞ্জী বা গ্রাম পরিচয় পাওয়া যায় যে গ্রামের নাম ব্রাহ্মণদের পদবি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাচীন লিপিমালায় এই ধরনের ১৫৬টি গাঞ্জী পরিচয় পাওয়া যায়। কালক্রমে ঐ গাঞ্জী পরিচয় প্রথা বিস্তৃত হয়ে একটি ভৌগোলিক সীমারেখার বন্ধনে আটকা পড়ে গ্রামে রূপান্তরিত হয়েছে। তখন গ্রাম কেবল ব্রাহ্মণের পরিচয়ের মধ্যে আর সীমাবদ্ধ থাকেনি; বিস্তৃত হয়েছে তার পরিধি।

তাম্রশাসনে আমরা অসংখ্য প্রাচীন গ্রামের উল্লেখ দেখি। গ্রামের আকার সর্বত্র এক ধরনের ছিল না-ছোট বড় নানা আকারের ও বিভিন্ন আয়তনের ছিল। ছোট গ্রামের পরিচয় ছিল পাটক (পাড়া) হিসেবে। ষষ্ঠ শতকের 'দামোদরপুর পট্টোলিতে[১]' দুটি পাটকের নাম পাওয়া যায়, এর একটি পুরাণ-বৃন্দিক হরি-পাটক অপরটি স্বচ্ছন্দ পাটক। বগুড়া জেলায় প্রাপ্ত প্রথম কুমারগুপ্তের বৈগ্রাম তাম্রশাসনে[২] ত্রিবৃতা ও শ্রীগোহালী নামে দুটি পাটকের নাম পাওয়া যায়।

একই শাসন সূত্রে জানা যায়, সাধারণত গ্রাম গড়ে উঠতো নদী বা অন্য ধরনের জলাশয়ের ধারে, যেখানে কৃষিকাজের জন্য উপযুক্ত ভূমি এবং

যাতায়াতের সুবিধা থাকত। একইভাবে গড়ে ওঠা গ্রাম শিল্প-বাণিজ্যে, শিক্ষায় ও সৎস্কৃতিতে গুরুত্ব পেত। অনেক সময় রাজা বা তার কোনো ক্ষুদ্র-প্রতিনিধিকেও এই শ্রেণির বর্ধিষ্ণু গ্রামে বাস করতে দেখা যেত। গ্রাম ছোট হোক-বড় হোক, বর্ধিষ্ণু হোক আর নাই হোক, সব গ্রামই দুভাগে বিভক্ত ছিল। একটি বাস্তুভূমি (বসতবাড়ি), অপরটি ক্ষেত্রভূমি (চাষের জমি)। এই দুভাগ ছাড়া গ্রামে থাকতো গোচরভূমি, তলভূমি, গর্তভূমি, ঊষরভূমি এবং গোপথ-গোবাট বা গোমার্গভূমি। গোচর বা গোচারণভূমির অবস্থান ছিল কৃষি জমির ধারে। গ্রামের সীমা ঘেষে গ্রামের ভেতর পর্যন্ত ছিল গোপথ-গোমাগ বা গোবাট। কোনো কোনো গ্রামে হট্ট বা হাট ছিল। প্রায় প্রতিটি গ্রামেই খাল, বিল, জোলা, জোলক, জোটিকা, খাট, খাটা, খাটিকা, খাড়ি, খাড়িকা, খানিকা, স্রোতিক, দীপ্ত, দীপিকা, গাঙ্গিনিকা, ঊষর হজ্জিক ও পুষ্করিণী ছিল। তাম্রশাসনে উল্লিখিত প্রতিটি নামই খাল-বিল, নদী-নালায় ভরা বাংলার নদীমাতৃক পরিবেশকে স্মরণ করায়। বলাবাহুল্য, নামগুলোর অধিকাংশই অবিকৃত অবস্থায় প্রচলিত আছে। জোলা শব্দ এখনও উত্তর-পূর্ব বাংলায় অনতিপ্রসর খালকে বলা হয়। জোলক বা জোটিকা জোলা শব্দের সমার্থক। খাট, খাটা, খাটিকা ইত্যাদি শব্দও ব্যবহৃত হয় খাল অর্থে। অনুশাসনের খাড়িমণ্ডল সম্ভবত খালবহুল জনপদ অর্থেই ব্যবহৃত হতো। খানিকা, স্রোতিকা, গাঙ্গিনিকাও খাড়ির সমার্থক। মরা নদীর খাত অর্থে গাঙ্গিনিকা এখন পরিচিত। হট্ট, হট্টি গ্রামের হাট এবং ঘট্ট-ঘাট হিসেবে এবং তার পারঘাটা বা খেয়াপারের ঘাট হিসেবে এখনও প্রচলিত। ঊষর অর্থে অনুর্বর আকর্ষণযোগ্য জমিকে বুঝান হতো।

গ্রামের বাইরে গোচরভূমির পাশেই ছিল বন বা অরণ্য। এই বন বা অরণ্য পরিষ্কার করেই যে গ্রামের পত্তন হতো, তার স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে তাম্রপট্টোলীতে। লোকনাথের তাম্রপট্টোলীতে[৩] লিপিবদ্ধ আছে, লোকনাথ সর্প-মহিষ-ব্যাঘ্র-বরাহ অধ্যুষিত আটবি ভূ-খণ্ডকে গ্রামরূপ দেবার জন্য দু'শ এগার জন ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেছিলেন। উল্লেখ্য, গ্রাম পত্তনির পর সঝাটবিপট, অর্থাৎ বন থেকে লোকেরা জ্বালানীকাঠ এবং ঘরবাড়ি তৈরি করার জন্য বাঁশ খুঁটি প্রভৃতি সংগ্রহ করতো। প্রাচীন বাংলার গ্রামগুলোর আকার আয়তন কেমন ছিল, তাম্রশাসনে তারও বর্ণনা আছে। বল্লাল সেনের নৈহাটি লিপিতে[৪] শ্লোকঃ ৩৭-৫৪) বল্লালহিট্ঠা নামে এক গ্রামের উল্লেখ আছে, যার বাস্তুভিটা আবাদি জমি, ঊষর বা পতিত জমি, খাল-বিলসহ আয়তন ছিল ৭ দ্রোণ ১ আটক ৩৪ উম্মান এবং ৩ কাক। লক্ষণ সেনের তর্পণদিঘি শাসনের[৫] বেলহিস্টি নামে এক গ্রামের পরিচয় পাওয়া যায়, যার আয়তন ছিল ১২০ আঢ়াবাপ ৫ উম্মান। এই সেনরাজার গোবিন্দপুর পট্টোলির[৬] বিড্ডারশাসন গ্রামের আয়তন সবসহ লি মাত্র ৬০ ভুদ্রোণ ১৭ উম্মান। অনুশাসনসমূহের বিবরণ থেকে বুঝা যায়, সে সময় ছোট বড় নানা আকারেরই গ্রাম ছিল।

জয়পুরহাট জেলার ক্ষেতলাল থানার সিলিমপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের ৪ নং শ্লোকে বালাগ্রাম, শরাবস্তি, তরকারি প্রভৃতি গ্রামের দারে শক্তি নামে একটি নদী-খাতের বর্ণনা আছে। এই শাসনে ছোট খাল হিসেবে জোলিকা এবং হাজা বা হাজিকা (haja/hajika)-এর উল্লেখ আছে। ২২৪ গুপ্তাব্দের দামোদারপুর শাসনে[৭] পলাশবৃন্দক নামে একটি স্থানের নাম আছে। এই স্থান হতেই শাসনোক্ত ভূদান বিষয়ক রাজকীয় কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছিল। অনুশাসনের পলাশবৃন্দক একটি বড় গ্রাম কিংবা কয়েকটি ছোট গ্রামের সমষ্টি বিশেষ ছিল। বর্তমানকালে দিনাজপুর শহরের অদূরে পলাশবাড়ি এবং পলাশডাঙ্গা নামক গ্রাম দুটিকে ঐ পলাশবৃন্দক হিসেবে কোন কোন ঐতিহাসিক শনাক্ত করেছেন। আরও কয়েকটি বড় গ্রামের পরিচয় পাওয়া যায়–বগুড়া জেলা বৈগ্রামে প্রাপ্ত প্রথম কুমার গুপ্তের বৈগ্রাম তাম্রশাসনে[৮]। গ্রামগুলো পুরাণবৃন্দিক হরি, পৃষ্ঠিমপোট্টক,

গোষাটপুঞ্জক, নিত্যগোহালী, বট-গোহালী, শ্রীগোহালী, ত্রিবৃতা প্রভৃতি। তবে শ্রীগোহালী এবং ত্রিবৃতা বায়িগ্রাম বা বৈগ্রামের অন্তর্ভূক্তি ছিল বলে মনে হয়। ঐতিহাসিকদের কারো কারো মতে, বটগোহালী গ্রাম পাহাড়পুরের গোয়ালভিটা গ্রাম। ধর্মপালের খালিমপুর শাসনে[৯] কৌঞ্চপুর গ্রামের সুন্দর বর্ণনা আছে। গ্রামটির পশ্চিমদিকে গাঙ্গিনিকা (মরানদী), উত্তর দিকে দেবকূল দেউল), পূর্ব-উত্তরে আলি (সেতু) গিয়ে শেষ হয়েছে লেবুবনে। গ্রামে বসবাসকারী কায়স্থ, মহামহত্তর প্রভৃতি বিষয়ব্যবহারী এবং করণ, ক্ষেত্রকর নামক পেশাজীবীর পরিচয়ও অবহিত হওয়া যায়। বলাবাহুল্য, লিপিভাষ্যে আরও জানা যায়, এই বিষয় ব্যবহারজীবী এবং পেশাজীবীদের সর্বপূজনীয় ছিলেন গ্রামের ব্রাহ্মণেরা।

বৈন্যগুপ্তের ষষ্ঠ শতকের গুণাইঘর তাম্রাশাসনে[১০] কন্তেড়ডক নামে একটি গ্রামের বিবরণ পাওয়া যায়। গ্রামটির অবস্থান নিম্নভূমিতে হলেও গ্রামে মহাযানী বৌদ্ধ ভিক্ষুদের একটি সংঘ ও দুটি ছোটখাটো বিহার ছিল। তাম্রশাসনের ১৮ থেকে ২৮ নম্বর শ্লোকে ঐ বিহারের চারপাশে বিলাল (বিল) হজ্জিক, খিলভূমি (খাল), নৌখাট, নৌযোগখাট থাকায় মনে হয়, গ্রামটি দক্ষিণবঙ্গে অবস্থিত, হয়ত এখানে ছোট একটি নৌবন্দরও ছিল। ফরিদপুরের কোটালিপাড়ায়[১১] প্রাপ্ত গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য এবং সমাচারদেবের শাসনসমূহে অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। দক্ষিণ বা নিম্নবঙ্গের জলাশয় ঘেরা অধিকাংশ ভূমিতে বন্য জীবজন্তু ঘুরে বেড়াত, ফসল তেমন হতো না। এ কারণে, রাজকোষে কোনো অর্থও সঞ্চিত হতো না। তবে কোটালিপাড়া অঞ্চল যে ব্যবসায় বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল, তা লিপির-নৌযোগ, নৌদণ্ডক, নাবতাক্ষেণী, নৌখাট শব্দের ব্যবহার থেকেই বুঝা যায়।

তাম্রশাসনে দেখা যায়, প্রাচীন বাংলার গ্রামগুলিতে গ্রামবাসীরা কৃষিকাজের পাশাপাশি বাঁশ-বেতের ও দারুশিল্পের কাজ, মৃৎ শিল্পের কাজ, লৌহজাত শিল্প তৈরির কাজ, কার্পাস ও অন্যান্য বস্ত্রশিল্প তৈরির কাজ করতো। বাঁশ, বেত, কাঠ, মাটি প্রভৃতি শিল্প তৈরির উপাদান গ্রামেই পাওয়া যেতো। বাঁশ-বেতের তৈজসপত্র, মাটির হাড়ি-ভাণ্ড, দা-কুড়াল, কোদাল, খন্তা লাঙ্গলের ফলা ইত্যাদির প্রয়োজন তো গ্রামের মানুষের ছিলই। রাজশাহী শহরের অদূরে প্রাপ্ত বিজয়সেনের দেওপাড়া লিপিতে কার্পাসফুল ও বিচি, তুলা এবং তুলাধুনার বর্ণনা পাওয়া যায়। তাম্রশাসনসমূহে গ্রামে বসবাসকারী গ্রামবাসীদের মধ্যে-ব্রাহ্মণ, মহত্তর, মহামত্তর, কুটুম্ব, ক্ষেত্রকর, ভূমিহীন, কৃষি শ্রমিক ছাড়া তন্তরায়-কুবিন্দকর, কর্মকার, কাংসকার, মালাকার, চিত্রকর, তৈলকার, সূত্রধর, তৌলিক, মোদক, তান্তুলি, শৌণ্ডিক, ধীরবর, জালিক, গোপ, নাপিত, রজক, আভীর, নট-নর্তক, বরুড় (বাউড়ী), চর্মাকার, ঘট্টজীবী (পাটনী), ডোলবাহী, ব্যাধ, হাড্ড (হাড়ি), ডোম, জোলা, বাগাতীত (বাগ্দী), বেদিয়া, মাংসচ্ছেদ, চণ্ডাল, কোল, ভীল্ল, শবর, পুলিন্দ, মেদ, পৌণ্ড্রক প্রভৃতি নিম্নকোটির জনগোষ্ঠীর পরিচয় পাওয়া যায়। শেষোক্ত কয়েকটি অন্ত্যজ পেশাজীবী সম্প্রদায় আদিবাসী পর্যায়ের। এরা পৃথক গ্রামে ও পৃথক পরিবেশে বসবাস করতো।

বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তি[১২] থেকে জানা যায়, সে সময়ে শিল্পী সম্প্রদায়ের সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। বরেন্দ্র শিল্পীগোষ্ঠী চূড়ামণি রাণক নিবাস ছিল প্রশস্তিমেত এই দেওপাড়াতেই। নারায়ণপালের ভাগলুর লিপি[১৩] এবং কেশবসেনের ইদিলপুর[১৪] অনুশাসনে উল্লেখ আছে, গ্রামে রমণীরা গলায় ফুলের মালা পরতেন এবং খোঁপায় বুনোফুল গুঁজতেন। ভাগলপুর[১৫] অনুশাসনে আছে, বুকের বসন স্থানচ্যুত হয়ে পড়ায় লজ্জায় আনত নয়না নারী কদাচিৎ লজ্জা নিবরণের জন্য তার গলার ফুলের মালার দ্বারা বুক ঢাকছেন। বিশ্বরূপসেন[১৬] ও সমসাময়িক অন্যান্য অনুশাসন মতে, সে সময়ের সাধারণ স্তরের রমণীরা বিশেষ করে বিবাহিতরা প্রতি সন্ধায় নদী বা দিঘিতে অবগাহন

শেষে প্রসাধনে অলংকারে শোভিত ও সজ্জিত হয়ে আনন্দে ও ঔজ্জল্যের প্রতিমা হয়ে বিরাজ করতো। দেওপাড়া শাসনে[১৭] আছে, রাজবাড়ির ভৃত্যের স্ত্রীরাও হার, কর্ণাঙ্গুরী, মালা, মল প্রভৃতি পরতো। অপরদিকে মুক্তাখচিত হার পরত রাজপরিবারের ললনারা। আবহমানকাল থেকেই প্রাচীন বাংলার পরিচয়ে সভ্যতার ধারক বাহক ছিল কৃষিজীব মানুষ। গ্রামই ছিল তার কেন্দ্রবিন্দু। প্রাচীন বাংলার ঐ গ্রামগুলোর অসংখ্য উপকরণ-উপাদান ধারণ করে আছে সমৃদ্ধ প্রত্নবস্তু তাম্রশাসন। আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের কাঠামোর পুনর্গঠনেই নয় কেবল, প্রাচীন বাংলার সামাজিক-অর্থনৈতিক-ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক এবং লোক ঐতিহ্যের উৎস আবিষ্কারেও এই প্রত্নসামগ্রীর রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

তথ্যপঞ্জি

১। রাধাগোবিন্দ বসাক : প্রথম কুমার গুপ্তের দামোদরপুর তাম্রশাসন, *ইপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিয়া*, ১৫শ খণ্ড, পৃ-১২৯

২। রাধাগোবিন্দ বসাক : প্রথম কুমার গুপ্তের দামোদরপুর তাম্রশাসন, *ইপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিয়া*, ২১শ খণ্ড, পৃ-৭৮।

৩। দীনেশচন্দ্র সরকার : শ্রীধরণ রাতের কইলাম তাম্রশাসন, *ইণ্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল কোয়ারটারলি*, ২৩শ খণ্ড, পৃ-২৩২-৩৩

৪। ননীগোপাল মজুমদার : বল্লালসেনের নৈহাটি তাম্রশাসন, *ইন্সক্রিপশন অব বেঙ্গল*, ৩য় খণ্ড, পৃ-৬৮-৭০

৫। ননীগোপাল মজুমদার : লক্ষণসেনের তর্পণদিঘি তাম্রশাসন, *ইন্সক্রিপশন অব বেঙ্গল*, ৩য় খণ্ড, পৃ-৯৯-১০৫

৬। ননীগোপাল মজুমদার : লক্ষণসেনের তর্পণদিঘি তাম্রশাসন, *ইন্সক্রিপশন "অব বেঙ্গল*, ৩য় খণ্ড, পৃ-৯২-৯৮

৭। দীনেশচন্দ্র সরকার : বুধগুপ্তের দামোদরপুর তাম্রশাসন, *সিলেক্ট ইন্সক্রিশন্স বিয়ারিং অব ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি এ্যাণ্ড সিভিলাইজেশন*, কলকাতা, ১৯৬৫, পৃ. ৩৩২-৩৩৩

৮। দীনেশচন্দ্র সরকার : প্রথম কুমার গুপ্তের বৈগ্রাম তাম্রশাসন, *সিলেক্ট ইন্সক্রিশন্স বিয়ারিং অব ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি এ্যান্ড সিভিলাইজেশন*, কলকাতা, ১৯৬৫, পৃ. ৩৫৬-৩৫৮

৯। রমা প্রসাদ চন্দ : *গৌড়লেখমালা*, রাজশাহী, ১৩১৯. পৃ.৯

১০। দীনেশচন্দ্র সরকার: প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪০-৩৪৪

১১। দীনেশচন্দ্র সরকার: প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৭-৩৫৮

১২। এফ. কীলহর্ণ : বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশাস্তি, *ইপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিয়া*, ১ম খণ্ড, পৃ-৩০৫

১৩। ই. হাল্টজ : নারায়ণ পালের ভাগলপুর তাম্রশাসন, *ইণ্ডিয়ান এন্টিকুয়ারী*, ১৫শ খণ্ড, পৃ-৩০৪

১৪। ননীগোপাল মজুমদার : প্রাগুক্ত, পৃ.-১১৮

১৫। ই. হাল্টজ : প্রাগুক্ত, পৃ.-৩০৪

১৬। ননীগোপাল মজুমদার : প্রাগুক্ত, পৃ.-১৩২

১৭। এফ কীলহর্ণ : প্রাগুক্ত, পৃ.-৩০৫

ড. সাইফুদ্দীন চৌধুরী
অধ্যাপক, ফোকলোর বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
সাবেক পরিচালক, বরেন্দ্র রিসার্স মিউজিয়াম, রাজশাহী

চর্যা-সংস্কৃতির আলোকে বুদ্ধ নাটকের ঐতিহ্য অন্বেষণ

সাইমন জাকারিয়া

সূচনা

চর্যাগীতি প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাসের আকর বা ভাবসম্পদ। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে প্রাচীন চর্যাগীতি বা চর্যা-সংস্কৃতি এবং তাতে উদ্ধৃতি বাংলার বৌদ্ধধর্মীয় সাধন-পদ্ধতি, গীতি, নৃত্য, নাট্য ঐতিহ্যের কথা একেবারেই অজ্ঞাত ছিল। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সেই অজ্ঞাত দুয়ার খুলে দেন, ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি নেপালের রাজদরবার গ্রন্থাগার[১] হতে প্রাচীন বাংলা চর্যাগীতির একটি পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন। শুধু তাই নয়, চর্যাগীতির পাণ্ডুলিপিটি তিনি সেখান থেকে সংগ্রহ এবং ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে আরও তিনটি পুঁথির সঙ্গে একত্রে *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা* নামে বিস্তৃত ভূমিকাসহ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন।[২] ভূমিকায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যা সংগ্রহের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন– "১৯০৭ সালে আবার নেপালে গিয়া আমি কয়েকখানি পুথি দেখিতে পাইলাম। একখানির নামা 'চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়', উহাতে কতকগুলি কীর্তনের গান আছে...গানগুলি বৈষ্ণবদের কীর্তনের মত, নাম 'চর্য্যাপদ'।... আমার বিশ্বাস, যাঁরা এই ভাষা লিখিয়াছেন, তাঁরা বাঙ্গালা ও তন্নিকটবর্তী দেশের লোক। অনেকে যে বাঙ্গালী, তাহার প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে।"[৩] যেমন– চর্যাগীতির সর্বাধিক পদের রচয়িতা কাহ্নুপার বাড়ি ছিল সোমপুর তথা বর্তমানে জয়পুরহাট জেলার পাহাড়পুরে। এই কাহ্নুপা এবং চর্যাপদের অন্যান্য কবি-গায়ক, নৃত্য ও নাট্যের শিল্পীরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজাদের শাসন আমলে নির্বিঘ্নে বাংলার চিরায়ত সংস্কৃতির মাধ্যমে জনগণের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মশিক্ষা দিতেন। কিন্তু ইতিহাসে প্রমাণ– বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী চর্যার কবিগণ অচিরেই বাংলায় সনাতন ধর্মাবলম্বী সেন রাজাদের রাজত্ব অধিগ্রহণের কারণে বিপন্নতার মুখোমুখি হন। এ পরিস্থিতিতে, আমাদের ধারণা– একদিকে চর্যার ঐতিহ্য বাহকেরা চর্যা সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে কিছুটা বদলে নিয়ে ভিন্ন নাম-পরিচয়ে সাধারণ জনতার মধ্যে মিশে যান, অন্যদিকে গবেষকদের ধারণা– চর্যার পাণ্ডুলিপিসহ চর্যাগীতি-নৃত্য ও নাট্যঐতিহ্যকে সঙ্গে নিয়ে বৌদ্ধ ধর্মানুসারী পার্শ্ববর্তী দেশ নেপাল ও তিব্বতে গমন করেন। সম্ভবত সেই সূত্রেই নেপালের রাজদার গ্রন্থাগারে স্থান পায় বাংলার প্রাচীনতম সাহিত্য-সাংস্কৃতিক নির্দশন চর্যাগীতির পাণ্ডুলিপি।

আমাদের সৌভাগ্য যে, প্রায় একশত বছর আগে, সেই পাণ্ডুলিপি আবিষ্কারের মাধ্যমে বাংলার প্রাচীনতম সাহিত্য-সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অনেক কিছুই এখন আর অজ্ঞাত নয়। অবশ্য এই চর্যা-সংস্কৃতির পরিচয় ও গবেষণা প্রথম থেকেই মূলত গ্রন্থকেন্দ্রিক ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত পুথি বা পাণ্ডুলিপিকেই আশ্রয় করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা অতীতে চর্চিত গবেষণাকর্মের পাঠ থেকে ভিন্ন পথের অভিযাত্রী হতে আগ্রহী। আমাদের এই আগ্রহের মধ্যে প্রথম প্রশ্নটি রাখি এভাবে– যে দেশের রাজদরবার গ্রন্থাগার থেকে চর্যাগীতির পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে, নিশ্চয় সে দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ভেতর দিয়ে চর্যাগীতির পরিবেশনারীতিরও সন্ধান মিলতে পারে। সেই আগ্রহ থেকেই কয়েক বছর ধরে ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে নানা দেশে সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে সাক্ষাৎ পাওয়া নেপালের অধ্যাপক-গবেষকদের সাথে মতবিনিময় করি, এমনকি লাইব্রেরির বই-পুস্তক ও ইন্টারনেটে অনুসন্ধান করি।[৪] জানতে পারি, নেপালে অদ্যাবধি বৌদ্ধ-তান্ত্রিক মন্দিরগুলোতে চর্যাগীতি-নৃত্যের কৃত্যাচার মূলক পরিবেশনার অস্তিত্ব যেমন রয়েছে, তেমনি সাধারণ মানের মন্দিরেও চর্যাগীতির পাঠাভিনয়, গীতাভিনয় ইত্যাদির অস্তিত্ব রয়েছে। পাশাপাশি নেপালের বিভিন্ন আবাসিক হোটেলে বাণিজ্যিকভাবে 'হেরিটেজ ট্যুরিজমে'র অংশ হিসেবে পর্যটকদের জন্য চর্যার গীতি-নৃত্যের পরিবেশনা প্রচলিত।

নেপালে চর্যা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রসমীক্ষা

চর্যা-সংস্কৃতির সাম্প্রতিক চর্চা নিয়ে যে সময়টাতে নানা ধরনের তথ্য সংগ্রহে তৎপরতা চলছিল, তারই মধ্যে উপমহাদেশীয় সংগীত ও নৃত্য প্রসার কেন্দ্র 'সাধনা' চর্যাগীতি অবলম্বনে রচিত নাটক 'বোধিদ্রুম'-কে চর্যানৃত্যনাট্যের আকারে প্রযোজনার সিদ্ধান্ত নেয়। মূলত চর্যানৃত্যের সৃজনশীল প্রকাশের তাগিদেই সাধনা'র উদ্যোগে *বোধিদ্রুম* নৃত্যনাট্যের পরিচালক ও সঙ্গীতাকারের সঙ্গে নাট্যকার-গবেষক হিসেবে নেপালে গিয়ে চর্যা-সংস্কৃতির বিচিত্র রূপ ও নৃত্য-গীতি নিয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ আসে। নেপালের কাঠমাণ্ডু শহর ক্ষেত্রসমীক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য বেছে নেওয়া হয়। কেননা, সেখানে নানাভাবে চর্যা-সংস্কৃতি ও গীতি-নৃত্যের প্রচলন রয়েছে। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে যে কাঠমাণ্ডু শহর থেকে চর্যার পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করা হয়েছিল, তার ঠিক একশত দুই বছর পর ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দে চর্যা-সংস্কৃতির সাম্প্রতিক চর্চা প্রত্যক্ষ ও প্রয়োজন মতো তার প্রশিক্ষণ গ্রহণই এবারের অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল। আসলে, খুব সচেতনভাবে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বা তৎপরবর্তীকালের অন্যান্য গবেষকের মতো শুধুই চর্যার পাণ্ডুলিপির খোঁজ বা সংগ্রহ আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমরা বরং তারচেয়ে বেশি কিছু অর্জন করতে চাই, যা দিয়ে চর্যা-সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত গীতি-নৃত্য-নাট্য পরিবেশনার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা সম্ভব হবে।

নেপালে প্রচলিত চর্যা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রসমীক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য আকাশপথে ২৫ অক্টোবর ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দে নেপালের কাঠমাণ্ডু শহরে নামি। আবস্থান গ্রহণ করি হোটেল বজ্রায়। এরপর নেপালের চর্যাগীতি-নৃত্যের পেশাজীবী সংগঠন দি ইনস্টিটিউট অব নেপালিজ পারফরমিং আর্টস 'কলা-মণ্ডপ'-এর প্রধান কর্ণধার ও চর্যার প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী রাজেন্দ্র শ্রেষ্ঠের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তাঁরই পরামর্শে আমাদের ক্ষেত্রসমীক্ষা শুরু হয় হোটেল ব্রজার পার্শ্ববর্তী স্বয়ম্ভুনাথ মন্দিরে।

হোটেল বজ্রা থেকে পায়ে হেঁটে স্বয়ম্ভুনাথ মন্দিরের যাবার পথ। পথের পাশে পর্যটক-ক্রেতাদের জন্য সাজানো বিভিন্ন ধরনের হ্যান্ডিক্যাফ্টের দোকান। প্রায় সকল দোকানেই বৌদ্ধের বিভিন্ন ধরনের মূর্তি ও স্মারক সাজানো; কাঠ, ধাতু, পাথর, চামড়া, মাটি, কাগজ ইত্যাদি নানা উপাদান দিয়ে বিভিন্ন ধরনের বৌদ্ধ সাধন-মুদ্রা অঙ্কিত শো-পিস্, সাজ-পোশাক, ধর্ম-উপাসনার প্রয়োজনীয় উপাদান শোভিত দোকানপাট। তবে, এ সকল বাণিজ্যের মোহ ছাপিয়ে চর্যা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য অপার বিস্ময় অপেক্ষা করছিল সুবিশাল উচ্চতার বিশাল স্বয়ম্ভুনাথ মন্দিরের চূড়ায়।

স্বয়ম্ভুনাথ মন্দিরটি বিশাল উঁচু একটি পাহাড়ের শীর্ষদেশে অবস্থিত। শতাধিক সিঁড়ি ভেঙে এই মন্দিরের চূড়ায় ওঠা সত্যি এক দুঃসাধ্য কাজ। তারপরও কেউ যদি বুকে সাহস নিয়ে একে একে সকল সিঁড়ি পেরিয়ে স্বয়ম্ভুনাথ মান্দিরের চূড়ায় পৌঁছাতে পারেন, তাহলে নিঃসন্দেহে দেখতে পাবেন– স্বয়ম্ভুনাথ মন্দিরের স্থানে স্থানে বৌদ্ধ ধর্ম-উপাসনা, নানা ধরনের কৃত্য, সেবা দান এবং অন্যদিকে একদল সংগীত-রসিক মানুষকে দেখা যাবে– হারমোনিয়াম, তবলা, করতাল বাজিয়ে নেওয়ারি (নেপালিজ) ভাষায় বাংলাদেশের বৈঠকী কীর্তনের মতো সমকালীন চর্যাগানের পরিবেশনা। আমাদের ক্ষেত্রসমীক্ষার অভিজ্ঞতা থেকে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে। কেননা, আমরা এমন দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছি এবং মন্দিরের পূজারি, গায়ক, ভক্ত, সাধকদের সাথে আলাপনে তা জানতে পেরেছি।

স্বয়ম্ভুনাথ মন্দিরে কীর্তনের মতো গানের পরিবেশনা দৃষ্টে প্রাসঙ্গিকভাবেই মনে পড়ে যায়– ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে চর্যাগীতির সংকলন-সম্পাদনার ভূমিকাপ্রবন্ধে রচিত চর্যার পরিবেশনারীতি সম্পর্কে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মন্তব্যটি, তিনি

স্বয়ম্ভুনাথ মন্দিরের চূড়ায় বৈঠকী কীর্তনের মতো চর্যাগীতির পরিবেশনা, ২৬ অক্টোবর ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ

বলেছিলেন– "গানগুলি বৈষ্ণবদের কীর্তনের মত, নাম 'চর্য্যাপদ'।"[৫] হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর এমন মন্তব্যের সাথে স্বয়ম্ভুনাথ মন্দিরে পরিবেশিত চর্যাগীতি পরিবেশনার দৃশ্যটি ঠিক ঠিক মিলে যায়। স্বয়ম্ভুনাথ মন্দিরের চূড়ায় চর্যাগীতির আসরটির ছিল অনেকটাই বাংলাদেশের বৈঠকী কীর্তন পরিবেশনার মতো। আর সে আসরের গায়কেরা বলেছেন যে,– তাঁরা প্রায় প্রতিদিনই স্বয়ম্ভুনাথ মন্দিরের চূড়ায় এ ধরনের চর্যাগান পরিবেশন করেন।[৬] তবে, অনেক সময় এ ধরনের চর্যাগীতির সাথে প্রার্থনায় নৃত্য, নাট্য ইত্যাদি প্রযুক্ত হয়। কিন্তু কেন? এ প্রসঙ্গে চর্যার নৃত্যশিল্পী ও পরিচালক রাজেন্দ্র শ্রেষ্ঠ জানালেন– নেপালে চর্যার গীতি-নৃত্যের চর্চা করেন প্রধানত বজ্রযানী বৌদ্ধরা, তাঁদের এই নাচের সঙ্গে মূলত তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম-সাধনা যুক্ত রয়েছে, তাই এই নৃত্য সচরাচার সাধারণের সামনে করার বিধান নেই।[৭] তিনি জানান, বজ্রযানী বৌদ্ধ-দর্শন গ্রন্থ হেবজ্রতন্ত্রে আছে– 'যদি তুমি সিদ্ধি লাভ করতে চাও তো নাচো।'[৮] এদিক দিয়ে নেপানের বজ্রযানীরা তান্ত্রিক নাচ ও গানকে ধ্যানের সমকক্ষ জ্ঞান করেন।

এ সকল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও আলোচনা-পর্যবেক্ষণের পর ২৭ অক্টোবর ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দে হোটেল বজ্রা-ও প্রতি মঙ্গলবারের হেরিটেজ ট্যুরিজমের অংশ হিসেবে চর্যানৃত্য পরিবেশনার দিন আসে। সেখানে উপস্থিত হয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষা জন্য বসে যাই। প্রত্যক্ষ করি যে, আসরের শুরুতে নৃত্যপরিচালক চর্যানৃত্য প্রত্যক্ষ করার জন্য দর্শকদেরকে কিছু নির্দেশনা দিয়ে বলেন– চর্যানৃত্য মূলত এক ধরনের তান্ত্রিক নৃত্য, এ ধরনের নৃত্য দেখার জন্য দর্শককেও কিছু নিয়মের ভেতর দিয়ে দর্শক হয়ে উঠতে হবে। তাই শুরুতে উপস্থিত দর্শকদের বজ্রযানীমতে ধ্যানে অংশ নিতে বলেন।

প্রত্যক্ষ করি, নানান দেশের দর্শকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই ধ্যানে অংশ নেন। এরপর চর্যানৃত্যে হাতির মুখোশ পরে 'গণেশ' নামের এক ধরনের নৃত্য পর্যবেক্ষণ করি। সাদার উপর খয়েরি রঙের পোশাক পরা গণেশের পায়ে নূপুর পরা থাকে, গলায় রূপালি ও সোনালি রঙের শিকল করা মালা থাকে। কোমরে সোনালী ধাতব বেল্ট, তার সঙ্গে রঙ মিলিয়ে হাতের ব্রেসলেটটিও হয় সোনালী। গণেশ নৃত্যের বিশেষত্ব হচ্ছে – ঘন ঘন উল্লম্ফন, শূন্যে ঘুর্ণন এবং তাদের হাত চালনার কাজটিও হয় বেশ আকর্ষণীয়।

গণেশের পর একে একে চর্যানৃত্যে বসুন্ধরা, বজ্রযোগিনী, বজ্রপাণী ইত্যাদি চরিত্রের সাধনকেন্দ্রিক নৃত্য উপস্থাপিত হয়। নাচের সময় নেপালি ভাষায় চর্যাগীতি ও তালের বিভিন্ন ধরনের নেপালী বোল ব্যবহৃত হয়। বাদ্যকর ও গায়কগণ আসরের এক পাশে বসে তৎক্ষণিকভাবেই সংগীত-বাদ্য পরিবেশনের মাধ্যমে নৃত্যশিল্পীকে সাহায্য করেন।

নেপালে প্রচলিত চর্যার গীতি-নৃত্যের সাথে একই সঙ্গে যেমন প্রাচীন বাংলা চর্যার বিভিন্ন পদে বর্ণিত নৃত্য পরিবেশনার বিবরণ মিলে যায়, তেমনি প্রাচীন চর্যা-সংস্কৃতির সমকালে নির্মিত পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারের মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ টেরাকোটায় অঙ্কিত দৃশ্যপট, আভারণ, নৃত্যমুদ্রা ইত্যাদির সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

এ পর্যায়ে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সেই অভূতপূর্ব আবিষ্কার 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়'-এর মূল পাণ্ডুলিপিটি স্বচোখে দেখবার অভিপ্রায়ে নেপালের রাজদার গ্রন্থাগারে (বর্তমানে ন্যাশনাল আরকাইভস অব নেপাল) গমন করি। কিন্তু গ্রন্থাগারের নতুন ক্যাটালগে অনেক খোঁজাখুঁজির পরও পাণ্ডুলিপির হদিস পাওয়া গেলো না। অবশ্য, অনেকবার যে পাণ্ডুলিপিটির তালিকাভুক্তির নম্বর পরিবর্তিত হয়েছে, তা আমাদের পূর্বেই জানা ছিল, কিন্তু কোনো নম্বরেই পাণ্ডুলিপিটির

হোটেল বজ্রাতে পরিবেশিত চর্যানৃত্য

সোমপুর বিহারের টেরাকোটায় নৃত্যমুদ্র

সন্ধান মিলল না। তাই আফসোস রইল, কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য এটুকুই যে, নীলরতন সেন-এর উদ্যোগে মূল চর্যাগীতির ফটোমুদ্রণ প্রত্যক্ষ করেছি। আর এ যাত্রায় নেপালের জাতীয় অভিলেখাগারে এসে প্রায় বারোটির মতো বাংলা বই-পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া গেলো, তাই-বা কম কী!

এবার বৌদ্ধকৃত্যের অন্তর্ভুক্ত চর্যার পুথি পাঠের ক্ষেত্রসমীক্ষা। নেপালের কাঠমাণ্ডু শহরের বজ্রযানী বৌদ্ধদের অন্যতম চর্যা পাঠক নরেন্দ্রমুণি বজ্রাচার্য। তিনি সাধারণত কৃত্যমূলক আয়োজনে চর্যার পুথি পাঠ করেন। তার নিকট লালসালু কাপড়ে মোড়া ১৭০টি পদের হাতেলেখা হলুদ রঙের একটি চর্যার পাণ্ডুলিপি আছে। তিনি সাধারণত সেই পাণ্ডুলিপি থেকে বিভিন্ন বৌদ্ধকৃত্যে বজ্রযানী বৌদ্ধদের চর্যা পাঠ করে শোনান। আমরা ব্যক্তিগত পর্যায়ে নরেন্দ্রমুণির নিকট থেকে কয়েকটি চর্যা পদের পাঠ শ্রবণ করি এবং তাঁর পাঠের মধ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সংকলনে গৃহীত একটি চর্যা পদের সাদৃশ্য আবিষ্কার করি। এরপর আর

নরেন্দ্রমুণি বজ্রাচার্যের চর্যাগীতি পাঠ

আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে, নরেন্দ্রমুণির নিকটে রক্ষিত চর্যার পাণ্ডুলিপির অন্তর্ভুক্ত অনেক পদের সাথেই হয়তো হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সংকলনের পদের ঐক্য খুঁজে পাওয়া যাবে। এ ধরনের অনুভব থেকে নরেন্দ্রমুণি বজ্রচার্যের পঠিত পাণ্ডুলিপিটির ফটোকপি সংগ্রহ করি। এরইমধ্যে বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় যে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংগৃহীত চর্যাগীতির পদসমূহের উপরে রাগ-রাগিনীর উল্লেখ থাকলেও গীত তালের উল্লেখ নেই। কিন্তু নরেন্দ্রের চর্যাগীতির পাণ্ডুলিপিতে প্রতিটি চর্যাগীতির উপরে সুর ও তালের উল্লেখ রয়েছে, যাকে আশ্রয় করে বিস্তৃত গবেষণার সুযোগ রয়েছে।

কাঠমাণ্ডুর বৌদ্ধ মন্দিরে ও হোটেলে চর্যা-সংস্কৃতির অংশ হিসেবে যথাক্রমে কৃত্য ও বাণিজ্যিকভাবেই চর্যার পরিবেশনা প্রত্যক্ষ করা যায় না; কাঠমাণ্ডুর পথে ভিক্ষারত বৌদ্ধ-ভিক্ষুকদের দেখা মেলে, যাঁরা ডমরু ও ঘণ্টা বাজিয়ে কাঠমাণ্ডুর পথে পথে এবং পর্যটকদের জন্য পসরা সাজানো দোকানে দোকানে গিয়ে ভিক্ষা করে ফেরেন। তাঁরা দুই হাতের সাহায্যে ডমরু-র বদ্ধ চামড়ায় ও ঘণ্টার বৃত্তাকার কাসায় অপূর্ব ধ্বনি তুলে মুখে বৌদ্ধমন্ত্রের সুর গেয়ে গেয়ে পথে পথে যেন সেই প্রাচীন কালের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেন। গভীর অবলোকনে তা দৃষ্টে মনে মনে সাধ জাগে– নেপালের রাজপথ থেকে বাদ্যধ্বনি, প্রাচীন বৌদ্ধ সুরের ইন্দ্রজাল বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনতে। আসলে, নেপালের বৌদ্ধভিক্ষুর ঐতিহ্যিক দেশনার সাথে বাংলার চিরায়ত ভক্তি-গান, দর্শন, সাধন-ভজন ইত্যাদি এবং বাংলাদেশের মানুষের আত্মার লুপ্ত ঐতিহ্যের জাগরণ ঘটিয়ে তা বৃহত্তর উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে দিতে পারলে এদেশের জাতীয়তাবোধের চেতনার আদিরূপটি সত্যিকার অর্থেই আবিষ্কার করা যেতো। শুধু তাই নয়, এ প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে সাধনমন্ত্রের মতো আমাদের অতীশ দীপঙ্করের সাধন-ভজন, চর্যাগানের ঐতিহ্য বাংলার মানুষের ইতিহাসের পাঠের স্মৃতি থেকে বাস্তবে প্রত্যক্ষ করানো যেতো। অথবা এদেশের কোথাও না, কোথাও লুপ্ত-সুপ্ত চর্যার পদে বর্ণিত নৃত্য, নাট্য, গীত ঐতিহ্য খুঁজে পাওয়া যেতো বা তার জাগরণ ঘটানো যেতো।

কাঠমাণ্ডুর পথে ডমরু ও ঘণ্টা বাদনরত ভিক্ষুকের সাথে

নেপালের চর্যানৃত্যমুদ্র

প্রাচীন বাংলার চর্যা-সংস্কৃতি *বুদ্ধ নাটক* ও চাকমা বৌদ্ধ নৃগোষ্ঠীদের *বুদ্ধ কীর্তন*

বুদ্ধ নাটক বাংলার প্রাচীনতম নাট্যধারা। এ ধরনের নাট্যধারাতে মূলত গৌতম বুদ্ধের বিভিন্ন ধর্ম-দেশনা, জীবনী, এমনকি তান্ত্রিক বৌদ্ধদের সাধন পদ্ধতির কথা সংগীত, নৃত্য, সংলাপ ও অভিনয়ের আকারে প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন স্থানে পরিবেশিত হতো। 'বুদ্ধ নাটক'-এর পরিবেশনারীতি সম্পর্কে প্রাচীন চর্যাপদে চমৎকার একটি বর্ণনা আছে, আর তা হলো–

'নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই॥'

এর অর্থ, বজ্রাচার্য (যিনি সাধক) নাচছেন, দেবী (যিনি সাধিকা) গান করছেন, 'বুদ্ধ নাটক' বিপরীতভাবে পরিবেশিত হয়। কেননা, সেকালের নাট্য পরিবেশনায় নৃত্যে সাধারণত নারীরা অংশ নিতেন আর পুরুষ কুশীলবগণ সংগীত পরিবেশন করতেন। কিন্তু 'বুদ্ধ নাটক' যেহেতু ছিল ধর্ম-দেশনা তথা বৌদ্ধ সাধন-পদ্ধতির প্রচারণামূলক নাট্য, তাই এর পরিবেশনায় অন্যান্য নাট্য উপস্থাপনার বিপরীতরীতি অনুসৃত হত। সম্ভবত এ কারণেই 'বুদ্ধ নাটক'-এর পরিবেশনাকে 'বিসমা' বলা হয়েছে।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত চর্যার ১৭ সংখ্যক পদে 'বুদ্ধ নাটক'-এর স্বরূপ সম্পর্কে এমন বিবরণ লভ্য। এ-পদটি বাংলার নাটকের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ও বাঙালির সাংস্কৃতি পরিচয় বিশ্লেষণের জন্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা, ঔপনিবেশীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তারে বাংলার অধিকাংশ মানুষের মনে একটি ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আর তা হলো– বাংলা নাটকের জন্ম অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে। অথচ এখানে আমরা, খ্রিষ্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রচিত চর্যায় বাংলায় প্রচলিত একটি বিশেষ ধরনের নাট্যরীতি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে চর্যা সমসাময়িক কালের অন্যান্য কিছু তথ্য, বিশেষ করে সাহিত্যিক ঐতিহ্যের সাথে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পুরাতাত্ত্বিক তথ্যকে কাজে লাগিয়ে আমরা এরই মধ্যে *প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটক*-এর স্বরূপ অন্বেষণ করতে সক্ষম হয়েছি।[১]

এরপর আমাদের মনে আরেকটি জিজ্ঞাসা জেগে ওঠে, তা হলো– কোনো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কোনো ভূখণ্ড থেকে একেবারে নিচিহ্ন হয়ে যেতে পারে কি? না-কি তার সূত্রগুলো ভিন্ন কোনো ঐতিহ্যিক তৎপরতার মধ্যে কোনো না কোনো ভাবে বেঁচে থাকে? চর্যা-সংস্কৃতির বিবেচনার ক্ষেত্রে এইসব প্রশ্নের সঙ্গত কারণ আছে। কেননা, বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্ত চর্যা-সংস্কৃতির পাণ্ডুলিপি খুঁজে পাওয়া যায়– নেপালে, তিব্বতে। বিংশ শতকের গোড়ার দিক থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের গবেষকগণ তা সংগ্রহের মাধ্যমে প্রকাশ করেই ক্ষান্ত থাকেন নি, উপরন্তু ওই সব দেশে চর্চিত নতুন চর্যা-সংস্কৃতির সম্পর্কে তথ্য হাজির করেছেন, আমারও নেপালে গিয়ে তার চলমান ধারা প্রত্যক্ষ করেছি। আবার একথাও তো সত্য, চর্যা-সংস্কৃতির গূঢ় ও তান্ত্রিক সাধনার ধারা পরবর্তীতে সহায়ক হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের নাথ ও সাধক-ফকির তথা বাউলদের ঐতিহ্যিক জাগরণে, গানে। এখনও বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে এই ধারা চলমান রয়েছে। এসব কথা বাংলাদেশের বিভিন্ন পণ্ডিত-গবেষক কর্তৃক বারবার স্বীকৃত।

আমাদের আগ্রহ চর্যার ধর্ম-দেশনা ও ভাব-শংকরের পাশাপাশি তার পরিবেশনারীতি নিয়ে। কেননা, চর্যার বিভিন্ন পদের ভেতর তার পরিবেশনারীতি সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের ইঙ্গিত আছে। অথচ বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করি– বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের কোথাও চর্যার সাম্প্রতিক পরিবেশনারীতির ঐতিহ্য, এমনকি চর্যার পদে উল্লিখিত 'বুদ্ধ নাটক'-এর সমসাময়িক অবস্থা সম্পর্কেও তেমন কোনো তথ্য পাই না। তাই আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষা ধর্মী অনুসন্ধান শুরু করি এবং তারই ফলস্বরূপ সম্প্রতি বাংলাদেশের পাবর্ত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী চাকমাদের মাঝে 'বুদ্ধ কীর্তন' নামে বিশেষ এক ধরনের 'বুদ্ধ নাটক'-এর সন্ধান পাই। এ ধরনের পরিবেশনারীতিতে চাকমারা সাধারণত ভগবান গৌতমবুদ্ধ তথা সিদ্ধার্থের সংসার ত্যাগের বিষয়টি উপস্থাপন করেন। তবে, মাঝে মধ্যে 'রাজা অশোক' এবং 'দাতা বেসান্তর'-এর কাহিনী চাকমাদের বুদ্ধ নাটকের আসরে পরিবেশিত হতে দেখা যায়।[৪] চাকমাদের পরিবেশিত বুদ্ধ নাটকের পরিবেশনারীতি নিয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করবো। তার আগে 'বুদ্ধ নাটক'-এর স্বরূপ অন্বেষণে আমাদের পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রাসঙ্গিকভাবে বাংলা ভাষার প্রাচীনতম বৌদ্ধ সাহিত্য নির্দশন চর্যার পরিবেশনারীতির অনুসন্ধান ও চর্যায় উল্লিখিত 'বুদ্ধ নাটক'-এর স্বরূপ সন্ধানের প্রবণতা সম্পর্কে কিছু কথা বলে নেওয়া যাক।

বুদ্ধ নাটক-এর স্বরূপ অন্বেষণ ও চর্যার পরিবেশনারীতি

আগেই বলা হয়েছে, 'বুদ্ধ নাটক' শব্দটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় প্রাচীন বাংলার চর্যার পদে। আর সেটির উল্লেখ রয়েছে বীণা পা রচিত চর্যার ১৭ সংখ্যক পদে। তাই এ-নাটকের স্বরূপ অন্বেষণে প্রথমেই চর্যার পদসমূহকে আশ্রয় করতে হয়। চর্যার একাধিক পদে প্রাচীন বাংলার যে পরিবেশনারীতির পরিচয় পাওয়া যায়, তা মূলত এক ধরনের সাংগীতিক পরিবেশনা, যার সঙ্গে রাগ-রাগিনীর ব্যবহারের কথা যেমন জানা যায় তেমনি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। একই সঙ্গে চর্যার সমসাময়িক কালের সাংগীতিক পরিবেশনার সাথে নৃত্য ও নাট্যের সংশ্লিষ্টতার কথাও জানা যায়।

চর্যার সাংগীতিক পরিবেশনার প্রথম প্রমাণ মেলে প্রতিটি পদের শীর্ষে নির্দেশিত রাগ-রাগিনীর উল্লেখে। চর্যার সকল পদের শীর্ষেই পটমঞ্জরী, রামক্রী, দেশাখ, কামোদ, ভৈরবী ইত্যাদি রাগ-রাগিনীর নির্দেশনা রয়েছে। শুধু তাই নয়, চর্যার পদ অভ্যন্তরে এর সাংগীতিক উপস্থাপনায় ব্যবহৃত বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ও তার সুরের ইন্দ্রজাল সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন– চর্যার ১৭ সংখ্যক পদে আছে– "বাজই অলো সহি হেরুঅবীণা/সুন তান্তি ধনি বিলসই রুণা ॥" অর্থাৎ ওলো সই, হেরুকের বীণা বাজছে, শূন্যতন্ত্রীর ধ্বনি মূর্ছিত হচ্ছে ক্ষীণ সুরে। এর অর্থ চর্যার সমসাময়িক কালের সাংগীতিক পরিবেশনার বাদ্যযন্ত্র ও রাগ-রাগিনী সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেল। এবার চর্যার গায়কী সম্পর্কে তথ্য দেওয়া যাক।

চর্যার সাংগীতিক উপস্থাপনা কোনো শিল্পী তথা গায়ক কর্তৃক যে পরিবেশিত হতো, তার প্রমাণ মেলে একাধিক পদে রচয়িতার ভণিতায় 'গীত', 'গাইতু', 'গাইল' ইত্যাদি শব্দ দেখে, যেমন– চর্যার ২ সংখ্যক পদে আছে– "অইসন চর্য্যা কুক্কুরীপাএঁ গাইল"; ১৮ সংখ্যক পদে আছে–"কাহ্নে গাইতু কামচণ্ডালী"; ৩৩ সংখ্যক পদে আছে– "ঢেন্ঢণ পাএর গীত বিরলে বুঝঅ" ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় সাধারণত গীত পরিবেশনার সময়ে বা গীত পরিবেশনার জন্য রচিত পদের ভণিতাতে এ ধরনের শব্দ ব্যবহারের একটি রীতি প্রচলিত রয়েছে। এখনও বাংলাদেশের সাধনকেন্দ্রিক পদ-পদাবলীর ভণিতা অংশে এ ধরনের শব্দ প্রযুক্ত হয়ে থাকে। প্রাচীন বাংলার চর্যার সমসাময়িক কালের সংগীত, নৃত্য ও নাট্য পরিবেশনার সামগ্রিক পরিচয় উদ্ঘাটনের লক্ষে চর্যার পদসমূহের পাশাপাশি অন্যান্য কিছু উপাদান ব্যবহার করা হয়। ক্ষেত্রে একদিকে যেমন চর্যা রচয়িতার জীবনী ও রেখাচিত্র, অন্যদিকে তেমনি চর্যার সমসাময়িক কালে নির্মিত সোমপুর বিহার ও তার মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ টেরাকোটা চিত্রকে ব্যবহৃত হয়েছে। আসলে, চর্যার পদে উল্লিখিত গীতি, নৃত্য ও সর্বোপরি বুদ্ধ নাটকের স্বরূপ বিচারের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসকারদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সুকুমার সেন, নীহারঞ্জন রায়, শশিভূষণ

দাশ গুপ্ত, সেলিম আল দীন, সৈয়দ জামিল আহমেদ প্রমুখ গবেষক উল্লিখিত উপকরণ ব্যবহার করেছেন। বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত 'প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটক' গ্রন্থ প্রণয়নে মূলত পূর্ববর্তী গবেষককৃত পদ্ধতি অনুসরণে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে। ওই গ্রন্থ প্রণয়নের পর নতুন করে আগ্রহ জন্মে– চর্যার পরিবেশনারীতির সাম্প্রতিক রূপ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে বুদ্ধ নাটকের বর্তমান স্বরূপ উদ্ঘাটনের প্রতি। এর কারণ, আর কিছু নয়, প্রাচীন বাংলার নাট্য পরিবেশনারীতির একটি সূত্র বাংলাদেশের সমসাময়িক কালের পরিবেশনারীতির সাথে যুক্ত করা। সেই লক্ষে বর্তমানে নেপালে প্রচলিত চর্যার বিচিত্র সাংস্কৃতিক ধারা পর্যবেক্ষণ করি। নেপালের চর্যা-সংস্কৃতি মূলত সে দেশের জাতীয় ঐতিহ্যের অংশ।

চর্যা-সংস্কৃতির নেপাল ও বাংলার বুদ্ধ নাটক

শুরুতেই নেপালের কাঠমাণ্ডুতে চর্যা-র নানা ধরনের সংস্কৃতি সম্পর্কে ক্ষেত্রসমীক্ষার বর্ণনা করা হয়েছে। উক্ত বর্ণনা বিশ্লেষণ করলে নেপালে অন্তত তিন ধরনের চর্যা-সংস্কৃত বা চর্যার উপস্থাপনা বা পরিবেশনা সংস্কৃতি প্রত্যক্ষ করা যায়, যথা– এক. বৌদ্ধ মন্দির প্রাঙ্গণে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সমবেত কণ্ঠে বাংলা কীর্তনের মতো চর্যার গানের পরিবেশনা, দুই. মন্দির প্রাঙ্গণে চর্যার হাতে লেখা পুঁথি পাঠ এবং তিন. চর্যার নৃত্যাভিনয়। আগেই বলা হয়েছে যে, নেপালের রাজদরবার গ্রন্থাগার (ন্যাশনাল আরকাইভ) হতে ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাংলা ভাষার প্রাচীন সাহিত্য নিদর্শন চর্যার পুঁথি সংগ্রহ করেন। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত অন্য তিনটি পুথির সাথে চর্যার সংকলন *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা* শীর্ষক গ্রন্থের ভূমিকায় চর্যার রচয়িতা ও পরিবেশনাকারী সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন– "যাঁরা এই ভাষা লিখিয়াছেন, তাঁরা বাঙ্গালা ও তন্নিকটবর্তী দেশের লোক। অনেকে যে বাঙ্গালী, তাহার প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে।" পরবর্তীতে রাহুল সংকৃত্যায়ন আবিষ্কৃত 'চতুরশীতি-সিদ্ধ-প্রবৃত্তি' বা চুরাশি সিদ্ধর কাহিনীর বিবরণে পাওয়া যায় যে, চর্যাগীতির সর্বাধিক পদের রচয়িতা কাহ্নুপার বাড়ি ছিল সোমপুর তথা বর্তমান বাংলাদেশের নওগাঁ-জয়পুরহাট অঞ্চলের পাহাড়পুরে। তিনি এবং চর্যাপদের অন্যান্য কবি-গায়ক ও নৃত্যশিল্পীরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজাদের শাসন আমলে নির্বিঘ্নে চর্যাগীতি-নৃত্য ও নাট্যের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মশিক্ষা দিতেন।

প্রায় একশত বছর আগে আবিষ্কৃত সেই চর্যা পাণ্ডুলিপির আশ্রয়ে প্রাচীন বাংলার সাহিত্যিক-দার্শনিক ও ধর্মীয় পরিচয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে চর্যার সমকালে প্রচলিত পরিবেশনারীতি সম্পর্কেও কিছু ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সে সম্পর্কে ক্ষেত্রসমীক্ষাধর্মী কোনো গবেষণা তেমন ভাবে চোখে পড়ে না।

আমরা চর্যা ও তার পদে উল্লিখিত 'বুদ্ধ নাটক'-এর পরিবেশনারীতি নিয়ে গবেষণার ব্যাপারে অধিক আগ্রহী। আগেও একবার বলা হয়েছে যে, প্রথম দিকে আমাদের ধারণা ছিল– নেপাল হতে যদি চর্যাগীতির পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হতে পারে, তবে সেখানকার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ভেতর চর্যা ও 'বুদ্ধ নাটক'-এর পরিবেশনারীতিরও সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। আর সেই আগ্রহ থেকে নেপালে গমন করি এবং চর্যা গীতি-নৃত্যের জীবন্ত ধারা প্রত্যক্ষ করি।

নেপালে বৌদ্ধ-সংস্কৃতির অংশ হিসেবে স্বয়ম্ভুনাথ মন্দিরের চূড়ায় নিত্য যেমন বৌদ্ধ ধর্মের উপাসনা সম্পাদিত হয়, তেমনি সমকালীন চর্যার গানও গীত হতে দেখা যায়। সেখানে একদল সংগীতরসিক হারমোনিয়াম, তবলা, করতাল বাজিয়ে সমকালীন নেওয়ারি ভাষায় নিরন্তর চর্যা পরিবেশন করেন, যার গায়কী ও সুর সমকালীন বাংলা কীর্তনের মতো। এ পর্যায়ে আমরা স্মরণ করতে পারি, আজ থেকে শতাধিক বছর আগে চর্যাগীতির পরিবেশনারীতি সম্পর্কে এর আবিষ্কারক হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মন্তব্য। তিনি লিখেছিলেন, চর্যার গানগুলো কীর্তনের মতো এবং সমকালীন কীর্তনের মতো তা আসরে গীত হতো। নেপালের স্বয়ম্ভুনাথ মন্দিরের পরিবেশিত চর্যার সমকালীন আসরটি তার ব্যতিক্রম নয়। অতএব একথা বলতে কোনো বাধা থাকে না যে, বৌদ্ধ-

সংস্কৃতির গানের কীর্তন ধারা প্রাচীন কাল থেকে অদ্যাবধি প্রবহমান রয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে যে, নেপালে চর্যা নৃত্যের সমকালীন ধারা প্রচলিত। আমাদের ধারণা, সেই নৃত্যরীতি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নতুন গবেষণার সূত্রপাত হতে পারে। প্রায় সহস্রাধিক পূর্বে বাংলা ভাষায় রচিত চর্যায় উল্লিখিত রয়েছে– 'একশো পদ্মা চৌষট্টি পাখুড়ি/তহি চড়ই নাচই ডোম্বী বাপুড়ি॥' উল্লেখ্য, এতদিন আমরা চর্যাপদে বর্ণিত এই নৃত্যরীতির সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছি কিছু চর্যা সমসাময়িক কালে নির্মিত সোমপুর বিহারের প্রাপ্ত টেরাকোটা চিত্রে। এখন সেই নৃত্যর সমকালীন ধারা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে নেপালে। বিষয়টি আগ্রহ উদ্দীপক এবং চর্যার পরিবেশনারীতির ঐতিহ্যিক বিশ্লেষণে এই নৃত্যরীতি আলোচিত হবার যোগ্য।

বাংলাদেশ যেহেতু চর্যানৃত্যের একটি অন্যতম আদি ভূমি, কিন্তু মহাকালের অভিঘাতে বাংলাদেশ থেকে যেহেতু এই নৃত্যধারা বিলুপ্ত, তাই আমরা এরইমধ্যে নেপালের চর্যা নৃত্য-গীত শিল্পীদের স্মরণাপন্ন হই। সেই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বাংলাদেশের নৃত্যশিল্পীরা এরমধ্যে বজ্রাচার্য মতের নেপালী বৌদ্ধ সংগীত-নৃত্যশিল্পীদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এখন প্রয়োজন এর পরিবেশনারীতির সমকালীন তাৎপর্য নিয়ে একটি গবেষণা।

ঢাকার কমলাপুর বৌদ্ধ বিহারের নেপালের নৃত্যশিল্পীর পরিবেশনায় চর্যানৃত্য, ১৯ অক্টোবর ২০১০ খ্রিষ্টাব্দ

বাংলাদেশের চাকমাদের 'বুদ্ধ কীর্তন' মূলত এক প্রকার 'বুদ্ধ নাটক'

দীর্ঘদিন ধরে চর্যা-সংস্কৃতির অনুসন্ধান ও তাৎপর্য বিশ্লেষণে একদিকে চর্যার পরিবেশনারীতির জীবন্ত রূপের অনুসন্ধানের তৎপরতা, অন্যদিকে চর্যাপদে উদ্ধৃত 'বুদ্ধ নাটক'-এর প্রাচীন ও সমকালীন স্বরূপ অন্বেষণে উদ্যোগ প্রত্যক্ষ করা গেছে। সেই উদ্যোগের পথেই অবশেষে বাংলাদেশের চাকমা নৃগোষ্ঠীদের মাঝে 'বুদ্ধ কীর্তন' নামে চর্যার পদে উদ্ধৃত 'বুদ্ধ নাটক'-এর একটি অভিনব ধারার সন্ধান লাভ করা যায়।

বাংলাদেশের চাকমা নৃগোষ্ঠীদের বর্তমান আবাস দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের ভারতের সীমান্ত ঘেষে পাবর্ত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে। এই নৃগোষ্ঠী মূলত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।

বাংলাদেশে বসবাসরত অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে জনসংখ্যার দিক থেকে চাকমা নৃগোষ্ঠী বৃহত্তর। এ নৃগোষ্ঠীর ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বাংলাদেশের বসবাসরত অপরাপর নৃগোষ্ঠীর চেয়ে অনেকটাই সমৃদ্ধ এবং স্বতন্ত্র। দীর্ঘদিন ধরে নিজস্ব ভাষায় এই জাতিগোষ্ঠীর সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য চর্চিত হয়ে আসছে। চাকমা নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের রয়েছে দুটি ধারা– একটি মৌখিক এবং অন্যটি লিখিত।

চাকমা নৃগোষ্ঠীর মৌখিকরীতির নিজস্ব পরিবেশনার মধ্যে 'গেংখুলী গীদ' অন্যতম। এ-রীতিতে চাকমা ভাষায় একাধিক পালা, যেমন– 'রাধামন-ধনপুদি', 'সান্দবীর বারমাসী' ইত্যাদি পরিবেশিত হয়ে থাকে। মূলত একজন গায়ক কর্তৃক বর্ণনাত্মক সংগীতের আকারে চাকমাদের 'গেংখুলী গীদ'-এর পালাগুলো বিভিন্ন উৎসব-আমোদে দর্শক-শ্রোতাদের মাঝে উপস্থাপিত হয়।

অপরপক্ষে চাকমাদের মধ্যে একাধিক নাট্যশিল্পী কর্তৃক আঙ্গিক-অভিনয়, নৃত্য, গীত ও সংলাপ আকারে বাংলা ভাষায় 'সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ' নামে 'বুদ্ধ কীর্তনে'র ধারায় 'বুদ্ধ নাটক'-এর এক ধরনের নাট্যপালার পরিবেশনা প্রচলিত। এ ধরনের নাট্যের পরিবেশনা সাধারণত কৃত্যমূলক এবং তা সচারাচার শ্রদ্ধার অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়।

আগেও একবার বলা হয়েছে, 'বুদ্ধ কীর্তন'-এর ধারায় এ ধরনের নাট্যপালাতে সাধারণত গৌতমবুদ্ধের জীবন-কাহিনী ও জীবন-দর্শন উপস্থাপিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, আসরে এই নাট্যপালা পরিবেশনামুহূর্তে হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি'র দুটি কপি ব্যবহৃত হয়। যার একটি ব্যবহার করেন মঞ্চের পাশে বসা প্রোম্‌টার এবং অন্যটি ব্যবহৃত হয় গ্রীনরুমে দৃশ্য-অঙ্ক অনুযায়ী অভিনয়শিল্পীদের আগমন-নির্গমনের নির্দেশনার কাজে ব্যবহৃত হয়।

খাগড়াছড়ি জেলার দিঘীনালায় শ্রাদ্ধের কৃত্যমূলক অনুষ্ঠানে চাকমা নৃগোষ্ঠীদের পরিবেশনায় বুদ্ধ কীর্তন 'সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ' পালার অভিনয়, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১২ খ্রিষ্টাব্দ

চাকমা নৃগোষ্ঠীর বুদ্ধ কীর্তন 'সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ' পালার অভিনয়ের দুটি দৃশ্য, গোপা চরিত্রে রূপদান করেন ধন চাকমা এবং সিদ্ধার্থ চরিত্রে রূপদান করছেন নিরাঞ্জন চাকমা

বাংলাদেশের চাকমা নৃগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত 'বুদ্ধ কীর্তন'-এর পালা 'সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ'-এর প্রধান প্রবণতা হলো, এটি মূলত এক ধরনের গীতিনাট্য। আর এর মঞ্চ ভূমি সমতলে বা কাঠের পাটাতন দিয়ে উঁচুও হতে পারে। এ ধরনের নাট্যপালার আসরের শুরুতে থাকে– বাদ্যযন্ত্রীদের সমবেত বাদ্যবাদন। তবে, মঞ্চে ওঠার আগেই এর অভিনয়শিল্পীরা চরিত্র অনুযায়ী সাজ গ্রহণ করে থাকেন। সাজ গ্রহণের জন্য কোনো স্থায়ী গ্রিনরুম বা সাজঘরের প্রয়োজন হয় না, কোনো বাড়ির উঠান বা মঞ্চের পেছনভাগ অথবা সাধারণ ব্যবহৃত কোনো ঘরে বসেই শিল্পীরা সাজ গ্রহণ করে থাকেন। অভিনয়শিল্পীদের সাজ গ্রহণের পর সমবেত বাদ্যযন্ত্র বাদনের মধ্যে পরিবেশনাস্থান ঘিরে বিভিন্ন বয়সী দর্শক-শ্রোতারা এসে বসেন। এরই মধ্যে চার-পাঁচজন কুশীলব এসে একটি প্রার্থনা গান পরিবেশন করেন। যেমন–

নম নম দয়াময় বুদ্ধ ভগবান
অহিংসা প্রচারিতে জন্ম লও অবনীতে
দয়া অবতার প্রভু কর না নিদান
জ্বরা ব্যাধি ভরা মৃত্যু দুঃখ হতে
মুক্ত কর আজি পতিত পাবন।
কর্ম রূপে ধর্ম শেখাতে জগতে
দেখাতে মানবে সুখময় নির্বাণ॥

এই প্রার্থনা গানের ভেতর দিয়ে চাকমাদের কৃত বুদ্ধ নাটকের সামগ্রিক দর্শন প্রকাশিত হয়েছে। চর্যায় বর্ণিত 'বুদ্ধ নাটকে'র স্বরূপ বিবেচনায় একথায় বারবার প্রকাশিত হয়েছে যে, 'বুদ্ধ নাটক'-এর আসরে সাধারণত বৌদ্ধ ধর্মের সাধনার পদ্ধতি, গৌতম বুদ্ধের জীবন আখ্যান বা তার মুখ নিঃসৃত বিভিন্ন বাণী আভিনয় আকারে নৃত্য-গীত-অভিনয় আকারে পরিবেশিত হতো।

সাম্প্রতিক কালে প্রচলিত চাকমাদের 'সিদ্ধার্থের গ্রহত্যাগ' নাট্যপালাতে গৌতম বুদ্ধের জীবনাভিজ্ঞতা ও মানব জীবনের মুক্তির লক্ষ্যে জ্ঞান অন্বেষণে তার সংসার ত্যাগ তথা সন্ন্যাস গ্রহণের কাহিনী বর্ণিত হয়ে থাকে।

এই নাট্যপালার ধারাবাহিক কাহিনীতে দেখা যায়– ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু ও বরুণ এসে বোধিসত্ত্বের কাছে বলেন–

"প্রভু আসিয়াছি দেবলোক হতে জানাইতে মর্তের বার্তা। জীবগণ হিংসায় পরস্পরে ভাসে মহা দুঃখের সাগরে, মিছে সুখ আজি কোটি কোটি প্রাণী বধ করিতেছে দেবতার নামে।

যাগ যজ্ঞ বিশ্বধরা পস্নাবিত হইল
ধর্ম কর্ম মনুষ্যত্ব লোকে ভুলে গেল।
ধর্ম প্রচারিতে লোকে জ্ঞান হারাইল
অহিংসা পরম ধর্ম লোকে ভুলে গেল
পশুত্ব পাইল ধরা, দেবত্ব ভুলিল
যজ্ঞ ধর্মে জীব রক্তে পৃথিবী ছাইল।"

প্রভু, জীব দুঃখ দূর করবার জন্য শুভ সময় উপস্থিত। আপনি এ সময়ে মর্ত্যধামে অবতীর্ণ হয়ে ধরার দুঃখ দূর করুন। প্রাণীগণ জ্বরা, ব্যাধি, মৃত্যু, দুঃখ সহ্য করতে না পেরে আপনার করুণা ভিক্ষা করিতেছে।"

তাদের কথার উত্তরে বোধিসত্ত্ব বলেন– "দেবগণ, বাস্তবিক জীব দুঃখ বিমোচনের শুভ সময় উপস্থিত। কিন্তু আমি নৃসিংহ রাম ও পশুরামের মতো অস্ত্রের সাহায্যে পৃথিবী জয় করবো না। আমি কেবল ভিক্ষা দেব প্রেম, প্রেমের দ্বারাই আমি পৃথিবী জয় করবো।"

রাম আদি অবতারে ধনু অস্ত্র ধারন করে
দৈত্য দানব করিল নাশন।
আমি কভু অস্ত্র না ধরিব, প্রাণে কারে না মারিব
প্রেমে করবো জগৎ উদ্ধার।
প্রেমে জগৎ জয় করিব।

কিন্তু দেবগণ মর্ত্যধামে অবতীর্ণ হওয়ার আগে আমাকে পাঁচটি বিষয় চিন্তা করতে হবে।"[১১]

কিন্তু সেই পাঁচটি বিষয়? চর্যার প্রথম পদে আছে, 'কায়া তরু বর পাঞ্চ বি ডাল/চঞ্চল চিএ পইঠ কাল।' অর্থাৎ 'শরীর গাছে পাঁচখানি ডাল/অধীর মনে ঢুকে পড়ে কাল।' চাকমাদের কৃত 'বুদ্ধ কীর্তন'-এর পূর্ণাঙ্গ নাট্যপালা 'সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ' শীর্ষক 'বুদ্ধ নাটকে'র সমকালীন আসরে বোধিসত্ত্ব সেই দেহতত্ত্বের ইঙ্গিত দিচ্ছে না তো?

আসলে, 'সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ' নামে চাকমাদের এই বুদ্ধ কীর্তন বা 'বুদ্ধ নাটক'-এর পরিবেশনা প্রত্যক্ষ করলে প্রতীকী অর্থে চর্যার পদে বর্ণিত দেহতত্ত্বের সাক্ষ্য মেলে। কেননা, সিদ্ধার্থ রাজপুত্র হয়ে মানবদেহের অসারতাকে প্রত্যক্ষ করে নির্বাণ তথা জ্ঞান লাভের দিকে ধাবিত হয়েছেন এবং সংসার ত্যাগের মাধ্যমে তিনি সেই গন্তব্যে পৌঁছেন। চাকমা জনগোষ্ঠীর শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে 'সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ' নাট্যপালাটি পরিবেশনার দুটি কারণ থাকতে পারে, যার একটি হলো– এটি বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধের পবিত্র জীবন কাহিনী, আর দ্বিতীয় কারণটি হলো– কেউ তিরোধান করেন, চাকমাদের ধারণায় তার মূলত দুই ধরনের গৃহান্তর ঘটে– এক. দেহ থেকে তার আত্মার গৃহত্যাগ ঘটে, এবং দুই. স্ত্রী-পুত্র-

চাকমা নৃগোষ্ঠীর উপস্থাপনায় বুদ্ধ নাটক 'সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগে'র অভিনয়, জানুয়ারি ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ

পরিবার বেষ্টিত সংসার থেকে তার গৃহতাগ ঘটে। তাই হয়তো গৌতম বুদ্ধের গৃহত্যাগ ঘটনার সাথে 'বুদ্ধ কীর্তন' নামের এই নাট্যপালা পরিবেশনার একটি গূঢ় ও কৃত্যমূলক সম্পর্ক যুক্ত করা হয়।

চাকমাদের 'বুদ্ধ নাটক' পরিবেশনারীতির মধ্যে গীত চরিত্রের সংলাপাত্মক গানের কোনো বাণীর সাথে অর্থগত দিক থেকে প্রাচীন চর্যার বেশ কিছু পদের সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করা যায়, অন্যদিকে মধ্যযুগের বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীরও সাদৃশ্য পাওয়া যায়। তাই নিশ্চিতভাবেই বলা চলে, অনেকটাই বাঙালিদের লোকচক্ষুর আড়ালে অবাঙালি চাকমাদের মাঝে এই নাট্যধারা (বুদ্ধ নাটক) বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্যিক অভিযাত্রা চর্যা ও বৈষ্ণব গীতিকাবিতার গীতল ধারাকে ধারণ করে নবরূপে উদ্ভাসিত হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

১ নেপালের রাজদারবার গ্রন্থাগার বর্তমানে জাতীয় অভিলেখাগার হিসেবে রূপান্তিত হয়েছে

২ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা,* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৯১৬

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. মুখবন্ধ ৪

৪ ফিলিপাইনের ম্যানিলাতে ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দে ইউনেস্কো আইটিআই ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসে বক্তৃতা প্রদান করতে গিয়ে কাঠমাণ্ডু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অভি সুবেদীর সাথে সাক্ষাৎ হয়। ব্যক্তিগত আলাপনে চর্যা-সংস্কৃতি নিয়ে কিছু তথ্য পাই। এরপর সার্ক সাহিত্য উৎসব ও সার্ক ফোকলোর উৎসবে ভারতে দিল্লি, আগ্রা ও চণ্ডীগড়ে অধ্যাপক অভি সুবেদীর সাথে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয় এবং একই সময় নেপালের আরো দু'একজন ফোকলোর গবেষকদের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতে চর্যা-সংস্কৃতির কথা জানতে পারি।

৫ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রাগুক্ত, পৃ. মুখবন্ধ ৪

৬ নেপালের কাঠমাণ্ডু শহরে অবস্থিত স্বয়ম্ভুনাথ মন্দিরে ২৬ অক্টোবর ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দে পরিবেশিত চর্যাগীতির শিল্পীদের সাথে ব্যক্তিগত আলাপন হতে প্রাপ্ত তথ্য।

৭ নেপালের কাঠমাণ্ডু শহরে অবস্থিত হোটেল বজ্রায় ২৭ অক্টোবর ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দে চর্যানৃত্যশিল্পী ও পরিচালক রাজেন্দ্র শ্রেষ্ঠের সাথে ব্যক্তিগত আলাপন হতে প্রাপ্ত তথ্য।

৮ প্রাগুক্ত

৯ সাইমন জাকারিয়া, *প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটক,* বাংলা একাডেমী, ২০০৭

১০ রাঙ্গামাটি জেলার চাকমা ভাষার নাট্যকার মৃত্তিকা চাকমা, খাগড়াছড়ির নয়নজ্যোতি চাকমা এবং কক্সবাজারের করুণাশ্রী ভিক্ষু নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং উপর্যুক্ত অঞ্চল সমূহে বিভিন্ন সময়ে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রসমীক্ষার অভিজ্ঞতার আলোকে।

১১ রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি অঞ্চলে পরিবেশিত বুদ্ধ কীর্তন 'সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ' পালা প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা ও সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির সমন্বিত পাঠের ভিত্তিতে কাহিনীর বর্ণনা প্রদত্ত হয়েছে।

সাইমন জাকারিয়া
সহকারী পরিচালক
বাংলাএকাডেমি, ঢাকা

নবসাজে প্রাচীন রাজধানীর ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ি

একেএম মুজ্জাম্মিল হক

রাজধানী ঢাকার অদূরে শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্বদিকে সবুজের সমারোহ আর বনানীর শ্যামলিমায় মনোরম স্থাপত্যশৈলী এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ছায়া ঢাকা, পাখি ডাকা। হৃদয় ছোঁয়া নৈসর্গিক পরিবেশে সোনারগাঁয়ের অবস্থান। এই সোনারগাঁয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে হাজার বছরের প্রাচুর্যময় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

মুঘল আমলে যে ২৪ বর্গমাইল আয়তনের এলাকা জুড়ে ছিল এর অবস্থান, এখন তার পরিচিতি নারায়ণগঞ্জ জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা হিসেবে। ১৪ শতকের প্রারম্ভে দিল্লি সুলতানের প্রতিনিধি শামসুদ্দিন ফিরোজ স্বাধীনতা ঘোষণা করে সোনারগাঁও থেকে নিজ নামে মুদ্রা প্রচারের পর এটি ইতিহাসের পাথুরে পাতায় নিজের স্থান করে নেয়। গবেষকদের মতে, সোনারগাঁয়ের প্রাচীন নাম সুবর্ণবিথী বা সুবর্ণগ্রাম। এই সুবর্ণগ্রাম থেকেই সোনারগাঁও নামের উদ্ভব। প্রবাদ আছে, 'মহারাজ জয়ধ্বজের সময় অত্র অঞ্চলে সুবর্ণবৃষ্টি হয়েছিল বলে এ স্থান সুবর্ণগ্রাম নামে পরিচিতি লাভ করে। এছাড়া অনেকে বলেন, বার ভূঁইয়া প্রধান ঈসা খাঁনের স্ত্রী সোনাবিবির নামানুসারে এর নাম হয়েছে সোনারগাঁও।

মধ্যযুগে সোনারগাঁ ছিল মুসলিম সুলতানদের রাজধানী। এর পূর্বে মেঘনা নদী, দক্ষিণ-পশ্চিমে শীতলক্ষ্যা, দক্ষিণে ধলেশ্বরী এবং উত্তরে ব্রহ্মপুত্র দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় এলাকাটি খুব উন্নত ছিল। সেজন্য অনেক রাজা-বাদশাহ সানন্দে সোনারগাঁয় রাজধানী গড়ে তুলেছিলেন। ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে ফখরুদ্দীন মোবারক শাহের সময়ে সোনারগাঁ পূর্ব বাংলার রাজধানী হিসেবে প্রথম মর্যাদা লাভ করে।

সে সময় সোনারগাঁও মুসলিম সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল। বার ভূঁইয়া প্রধান মসনদ-ই-আলা ঈসা খাঁর আমলে সোনারগাঁও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে খ্যাতির শীর্ষে আরোহন করে। সোনারগাঁও বিদেশি খ্যাতনামা পরিব্রাজক ও ব্যবসায়ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। ইবনে বতুতা, মাহুয়ান, ফাহিয়েন, রালফ্ ফিচ প্রমুখ পর্যটক-পরিব্রাজকগণ সোনারগাঁয় শুভাগমন করেছিলেন। মুঘল সুবেদার ইসলাম খান এর সময়ে ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গীর নগরে তথা ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার পর সোনারগাঁয়ের গুরুত্ব ম্লান হয়ে যায়। ফলে সোনারগাঁয়ের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক প্রাধান্যও হ্রাস পায়। চুরি এবং ধ্বংসাত্বক কর্মকাণ্ড বাংলার প্রাচীন রাজধানীর জৌলুস ও সাংস্কৃতিক সম্পদ বিলুপ্তির প্রধান কারণ।

সোনারগাঁও এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় গড়ে ওঠা অভিজাত আবাসিক ভবন ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রসহ ঔপনিবেসিক শাসনামলে এখানে বসবাসকারী অধিবাসীদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির স্বাক্ষর বহন করে। এটি পরবর্তী ২০ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়। সুলতানি আমলের পর কেটে গেছে অনেক বছর, তথাপি এসব নিদর্শন সেই গৌরবময় দিনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। মূলত সোনারগাঁও আমাদেরকে নিয়ে যায় সোনালি অতীতের কাছে। ১৯৭৫ সালের ১২ মার্চ একটি প্রজ্ঞাপন বলে সরকার বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে।ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্সের আয়তন ১৭০ বিঘা। দেশীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে এখানে দুটি লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর রয়েছে। এছাড়া বাংলা নববর্ষ বরণ উপলক্ষে তিনদিনব্যাপী বৈশাখী মেলা বসে। এ মেলায় প্রায় ৬০ হাজার দর্শক বর্ষবরণ উৎসবের আনন্দোযজ্ঞে সমবেত হয়। বছরে প্রায় ১০ লক্ষ পর্যটক সোনারগাঁও জাদুঘর পরিদর্শন করে।

অনুসন্ধিৎসু পর্যটকের কথা ভেবে সামাজিক দায়িত্বের অংশ হিসেবে বাংলাদেশে এটিই প্রথম বেসরকারি উদ্যোগে দেশের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে রেস্টোরেশনের মাধ্যমে বড় সরদারবাড়ির আসল চেহারা ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা। কোরিয়া ভিত্তিক

বহুজাতিক কোম্পানি ইয়াংওয়ান করপোরেশন বিগত চারবছর অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে হারিয়ে যেতে বসা কালের সাক্ষী ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ির প্রকৃতরূপ ফিরিয়ে আনতে কাজ করছে। রোস্টোরেশন কাজ শেষে আগের চেহারা ফিরে পাবে বড় সরদারবাড়ি। একই ভবনে চারটি জেনারেশনের স্থাপত্যশৈলী অবলোকন বাংলাদেশে বিরল ঘটনা। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের দর্শনীয় স্থানসমূহের মধ্যে ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ি পর্যটকদের সবচেয়ে আকর্ষণীয় নিদর্শন হিসেবে সমাদৃত হবে।

বড় সরদারবাড়ি পুনরুদ্ধার প্রকল্পের উদ্দেশ্য

সোনারগাঁয়ের প্রাণকেন্দ্রে বিখ্যাত বড় সরদারবাড়ি মুসলিম ঐতিহ্যিক স্থাপনার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যার পরিচিতি বাংলার প্রতাপশালী শাসক ঈশা খাঁর বাড়ি হিসেবে। বার ভূঁইয়া, মুঘল আর ব্রিটিশ, সময় হিসেবে প্রায় ৬০০ বছর। বাংলার স্থাপত্যশৈলীর প্রায় সব নিদর্শন যেন একসাথে গাঁথা নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ের এই বাড়িটিতে। সময়ের বিবর্তন আর নগর আগ্রাসনে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে যেতে বসেছিল ইতিহাসের এই ঐশ্বর্য। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সরকার সরদারবাড়িখ্যাত প্রাচীন ইমারতসহ ভূমি অধিগ্রহণ করে। আশির দশকের শেষদিকে প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর কর্তৃক আংশিক সংস্কারের পর এটিতে লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর গড়ে তোলা হয়। দীর্ঘ ৩৫ বছরব্যাপী বাংলাদেশে বিনিয়োগের মাধ্যমে এদেশের মানুষের সাথে সাং কিহাকের গভীর আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন রাজধানীর স্মৃতি বিজড়িত এই ভবন পরিদর্শনে এর জীর্ণ দশা দেখে কর্তৃপক্ষের সাথে বড় সরদারবাড়ির প্রকৃত সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনতে কথা বলেন। তারই অংশ হিসেবে বিগত ০৩ জানুয়ারি ২০১২ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং দক্ষিণ কোরিয়ার ইয়াংওয়ান করপোরেশনের মধ্যে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের বড় সরদারবাড়ির রেস্টোরেশন কাজের ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষর হয়।

সামাজিক দায়িত্বপূর্ণ দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে বাংলাদেশে এককভাবে সবচেয়ে বড় বিদেশি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কোরিয়া ভিত্তিক বহুজাতিক কোম্পানী অনুদান হিসেবে ইয়াংওয়ান করপোরেশনের চেয়ারম্যান ও কোরিয়া ইপিজেড-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক ও শিল্পপতি মি. কিহাক সাং বড় সরদারবাড়ি যথাযথ বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণ করার মাধ্যমে রাজসিকতা ফিরিয়ে আনতে অনন্য উদ্যোগ নিয়েছেন। যা এদেশের মানুষের ঐতিহ্য, আভিজাত্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরবে। আলোচিত রেস্টোরেশন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ভৌত অবকাঠামো ফিরিয়ে আনার পর এ ভবনের সম্মুখভাগে রাজকীয় জীবনধারাকে জীবন্ত করে তোলা হবে। আর এ বাড়ির পেছনের অংশে লোক ও কারুশিল্প জাদুঘরে রূপান্তরিত করা হবে। বাংলাদেশে সর্বোচ্চ বিনিয়োগকারী ব্যতিক্রমী উদ্যোগের বিষয়ে জানতে চাইলে কোরিয়া ইপিজেডের প্রেসিডেন্ট মি.জাহাঙ্গীর সা'দাত বলেন,"আলোচিত রেস্টোরেশন প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বড় সরদারবাড়ির প্রকৃত সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনা। বড় সরদারবাড়ির মত ইতিহাসের এক অমূল্য সম্পদটিকে তার প্রকৃতরূপ ফিরিয়ে দিতে তথা পুরাকীর্তি পুনরুদ্ধারে ইয়াংওয়ান কোম্পানির রেস্টোরেশন দৃষ্টান্ত (example) যদি অন্য মাল্টিনেশান কোম্পানি বা কর্পোরেট বড়ি পরিবর্তনের দ্বারা উপযোগী (adapt) করে দেশের একটা একটা হেরিটেজ সাইট That will be wandarful story for Bangladesh"

বড় সরদারবাড়ি রেস্টোরেশন প্রজেক্টের প্রকল্প পরিচালক এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগের বিভাগীয় প্রধান বিশিষ্ট স্থপতি, অধ্যাপক ড. আবু সাঈদ এম আহমেদ পুরোনো ভবনের রেস্টোরেশন কাজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "কথিত সরদারবাড়ি ঐতিহাসিক সোনারগাঁয়ের প্রাণকেন্দ্রে নির্মিত মধ্যযুগীয় উল্লেখযোগ্য একটি স্থাপনা। অনুপম স্থাপত্যশৈলীতে অলঙ্কৃত এই প্রাচীন স্থাপনাকে ঘিরে বিভিন্ন সময়ে সংস্কার-সম্প্রসারণ কাজ সংঘটিত হয়। অনিন্দ্যসুন্দর অলঙ্করণশৈলীতে সুশোভিত বহুল আলোচিত ভবনটিতে তিনটি অংশ রয়েছে। ইমারতটির মূল অংশ মধ্যভাগ ঈশা খাঁর সময়ে অথবা প্রাক মুঘল আমলের। এটি প্রায় ৬০০ বছরের পুরোনো। ইমারতটির পেছনের অংশের নির্মাণ

উপাদান, নির্মাণশৈলীর বৈশিষ্ট্য অবলোকনে সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় এটিও মুঘল আমলের প্রথম দিকের কাজ। ভবনের অসংখ্য কক্ষের নমুনা, এর আকার আয়তন পরিদর্শনে বোঝা যায় এটি কোন আবাসিক ভবন ছিল না। মূলত ভবনটি ছিল বাণিজ্যিক বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভবন। সম্ভবত ইমারতটি এতদাঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার কাজে ব্যবহৃত হতো। অর্থাৎ একটি ভবনে প্রাক ইসলামী, প্রাক মুঘল, বার ভূঁইয়ার স্মৃতি ও ব্রিটিশ কলোনিয়াল স্মৃতি এই ৪টি জেনারেশনের স্থাপত্যশিল্পের গুণাবলী আমার মনে হয় বাংলাদেশে খুব কম ভবনেই আছে"।

বড় সরদারবাড়ির বৈশিষ্ট্য

তথ্যানুসন্ধানে সরজমিন পরিদর্শনে দেখা গেছে দ্বিতল বিশিষ্ট বড় সরদার বাড়ি দু'টি ভাগে গড়ে উঠেছে। দৃষ্টিনন্দন পুরোনো এ ইমারতটিতে দু'টি আঙিনা রয়েছে। লাল রঙের বর্গাকৃতির এই ভবন দু'টি ইমারতের মধ্যস্থলে নির্মিত। এ ইমারতটি প্রাচীন মুঘল আমলের অনুপম স্থাপত্যশৈলীর কথা মনে করিয়ে দেয়। বিশেষত এটি বাংলার বার ভূঁইয়ার সময়ে গড়ে উঠেছে বলে অনুমিত হয়। আলোচ্য ভবনের পেছনের আঙিনার চারপাশে তিনটি ভবন মুঘল আমলের প্রথম দিকে নির্মিত।

ইমারতটিতে ব্যবহৃত নিদর্শন থেকে জানা যায়, এই অংশ শিল্প-কারখানার কাজে ব্যবহার করা হতো। সরদারবাড়ির বর্তমান প্রধান ফটক একটি আর্কওয়ের ভেতর দিয়ে নির্মিত, যা অপেক্ষাকৃত নীচু ও চিন্নিটিকরি (চীনা মাটির সিরামিকের ভাঙা অংশ) দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছে। এই ইছাপাড়া ভবনের রাজকীয় সামনের অংশ রয়েছে পশ্চিমদিকের শান-বাঁধানো পুকুরের ধারে। এখানে দু'টি ঘোড়ার ওপর দু'জন অশ্বারোহী সুসজ্জিত সৈনিক সরদারবাড়ির শান-সৌকতের কালের স্বাক্ষী হয়ে এখনও দণ্ডায়মান। মূল্যবান এ স্মৃতি চিহ্নটি বাংলার প্রাচীন রাজধানীর পরিচিতি বহন করছে।

রেস্টোরেশনের আওতায় সংস্কার কাজের অংশ হিসেবে উচ্চ সজ্জার দেয়াল ও তল, ফ্লোরের ফিনিশিং কাজ, চিন্নিটিকরি সাজসজ্জা, কাঠের পাটাতনের নীচে লোহার পাত বা ভীমের প্রতিস্থাপন, পুরোনো রাজকীয় বাড়ির দরজা-জানালা সংযোজন, মূল ফটক, কাঁচের ছাদ, মেঝেতে মার্বেল পাথর স্থাপন, ভবনের পূর্ব ও পশ্চিমপাড়ের ঘাট সংস্কার, উন্নত ড্রেনেজ সিস্টেম চালু এবং দীর্ঘ এক বছরের বেশি সময় যথাযথ গবেষণা করে রাজকীয় এ ভবনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আসবাবপত্র ও তৈজসপত্র প্রদর্শনের বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

এক নজরে বড় সরদারবাড়ি

সরদারবাড়ির সম্মুখভাগ : প্রধান গেইট : ১টি, নীচতলায় বারান্দা : ৪টি, দ্বিতীয়তলা বারান্দা : ৩টি, নীচতলা বাইরের দিকে বারান্দা : ১টি, সিঁড়ি : ১টি, উন্মুক্ত প্যাভিলিয়ন : ১টি, নীচতলায় কক্ষ : ৭টি, দ্বিতীয়তলায় বারান্দা ১টি, কক্ষ : ৭টি, সম্মুখভাগে কক্ষসংখ্যা : ১৪টি।

প্রাক মুঘল অংশ : নীচতলায় কক্ষ : ৯টি, দ্বিতীয়তলায় কক্ষ ৯ টি, প্রাক মুঘল অংশে কক্ষসংখ্যা : ১৮টি, সিঁড়ি : ১টি, মূল ভবনের পূর্বদিকের বর্ধিতাংশে কক্ষ ২টি । প্যাভিলিয়ন ১টি। এটিকে একটি কিচেনেট ও কফিসপে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এখানে ভিভিআইপি ও ভিআইপি অতিথিদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হবে বলে আশা করা যায়।

মুঘল অংশ : দ্বিতীয় অংশে বারান্দার সংখ্যা : ৪টি, উন্মুক্ত প্যাভিলিয়ন : ১টি, কর্টিয়াটের চার পার্শ্বের কড়িডোরের বাইরের দেয়ালে উৎকীর্ণ লিপি পূর্বদিকে ॥ নমো শ্রী গৌরগোবিন্দ ॥ পশ্চিমদিকে ॥ শ্রী গোবিন্দায় নমো নম ॥ উত্তরদিকে ॥ নমস্তে শ্রী গোপীনাথ ॥ দক্ষিণদিকে ॥ নমস্তে শ্রী ঋষিকেশ ॥

নীচতলা পূর্বদিকের কক্ষসংখ্যা : ৮টি। নীচতলা পশ্চিমদিকে কক্ষসংখ্যা : ৮টি, দ্বিতীয়তলায় পূর্বদিকে কক্ষ : ৮টি, দ্বিতীয়তলায় পশ্চিমদিকে কক্ষ : ৮টি, পূর্বদিকে সিঁড়ি : ১টি, পশ্চিমদিকে সিঁড়ি : ১টি, উত্তরদিকে সিঁড়ি : ১টি, উত্তরদিকে নীচতলার কক্ষ : ৯টি, উত্তরদিকে দ্বিতীয়তলায় কক্ষ: ৯টি, দ্বিতীয় ভাগে মোট কক্ষসংখ্যা: ৫০টি। দ্বিতীয় ভাগে সিঁড়ি : ৩টি, সম্প্রসারিত অংশ তৃতীয় ভাগে কক্ষের সংখ্যা ৩টি।

উপরে ওঠার সিঁড়ির সংখ্যা ১টি, উন্মুক্ত কড়িডোর ১টি।

বহুল আলোচিত এই ভবনের মোট আয়তন ২৭ হাজার ৪০০ বর্গফুট।রেস্টোরেশন ড্রয়িং অনুযায়ী বড় সরদার বাড়িতে নীচতলায় কক্ষসংখ্যা ৪৭টি। দ্বিতীয়তলায় কক্ষসংখ্যা ৩৮টি। সর্বমোট কক্ষ সংখ্যা ৮৫টি। বিভিন্ন উচ্চতার ছাদ ২৩টি । সিঁড়ি সংখ্যা ৬টি, লিফটের সংখ্যা ১টি, খড়খড়ি দরজা আনুমানিক ৪৯টি, খড়খড়ি জানালা (ছোট বড়) আনুমানিক ১৬৮টি, ফিক্সড্ কাচের জানালা আনুমানিক ১৮টি। সরদারবাড়ির পূর্বদিকে পুকুর আছে। এতে ৩টি শান-বাঁধানো ঘাট রয়েছে। পুকুরের পশ্চিমপাড়ের পুরো অংশ ইটের দেয়াল দ্বারা পাড় ভেঙ্গে যাওয়া নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। এ বাড়ির পশ্চিমদিকেও পুকুর আছে। এতে ৩টি শান-বাঁধানো ঘাট আছে।

ড. সাঈদ আরো বলেন, "ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এসে আলোচ্য ভবনের তিনটি অংশকে একত্রিত করে সংস্কার সম্প্রসারণ কাজ পরিচালিত হয়। প্রায় ৬০০শত বছরের পুরোনো ইছাপাড়া ভবনের মালিকানা পরিবর্তনের পর ভবন মালিকের ইচ্ছানুযায়ী কিছু অলঙ্করণ কাজ করা হয়েছে।" ঐতিহাসিক এই আবাসিক ইমারতের সম্মুখভাগের লিখন অনুযায়ী জানা যায় প্রধান ফটকে॥ সন ১৩০৮ সাল শ্রী শ্রী যুক্ত ওঁ গোপীনাথ জিউর॥ এবং সবশেষে ১৩৩০ সালে ভবনটির সংস্কার কাজ করা হয়েছে। এর প্রমাণ সংস্কার কাজ শেষে ভবনের দেয়ালে উৎকীর্ণ লিপিতে রয়েছে॥ শ্রী শ্রী যুক্ত গোপীনাথ জীউর শ্রী শ্রী চরণ ভরসা॥ সেবক বাশীনাথ সাহা সরদার সন ১৩৩০ সন ইছাপাড়া ভবন॥ বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনে দীর্ঘ দু'দশক জনসংযোগের দায়িত্ব পালনকালীন অভিজ্ঞতায় অগ্রজপ্রতিম ব্যক্তিবর্গের পর্যালোচিত অভিমত ও আমার ধারণা ১৯০১ ও ১৯২৩ সালে ভবনটিতে সংস্কার কাজ শেষে সময় কাল লিখা হয়েছে।

যা হোক, সোনারগাঁও এবং ঈশা খান একে অপরের পরিপূরক। এর কিছুটা ইতিহাস, কিছুটা কিংবদন্তি এবং অবশিষ্টাংশ এখনও ঐতিহাসিকগণের কাছে বিস্ময় হয়ে আছে। ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে মুঘল সাম্রাজ্যবাদ ও আগ্রাসী ভূমিকার বিরুদ্ধে ঈশা খান যে কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন তা ইতিহাসে তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। ঐতিহাসিক আবুল ফজল 'আইন-ই-আকবরীতে ঈসা খাঁকে স্বাধীন নৃপতি উল্লেখ করে লিখেছেন, Isa khan, Zamindar of Bhatia spent his time in dissimulation ..... Isa acquired fame by his ripe judgment and deliberateness and made the 12 Zamdinar of Bengal subject to himself. Out of foresiht and cautiousness, he refrained from waiting upon the ruler of Bengal, Though he rendered servic to them and sent them presents. From a distance, he made use of submissive language. (Akbarnamah, III, p. 647)

ঈসা খাঁনের সাথে সোনারগাঁয়ের সম্পর্কের বিষয়ে রালফ্ ফিচ লিখেছেন, They be all here about rebels against their king Zebaldin Echeber (Jalaluddin Akbar). For here are so many rivers and islands the they flee from one to another ... where by his hore men cannot prevail against them ..... Sinnergan (Sonargaon) is a town six leagues (ie. 18 miles) from Serrepore (sripur) .... The chef king of all these countries is called Isacan (Isa Khan and he is chief of all other king (journal of the Asiatic Society of Baegal, Calcutta 1904, p61).

বার ভূঁইয়া প্রধান মসনদ-ই-আলা ঈসা খানের তিনটি রাজধানী ছিল। কাত্রাভু, সোনারগাঁও এবং জঙ্গলবাড়ি। এই তিনটি জায়গার মধ্যে সোনারগাঁও ছিল তাঁর অন্যতম প্রধান রাজধানী। অনুসন্ধিৎসু পর্যটকের প্রশ্ন সোনারগাঁও রাজধানী হলে কোথায় ছিল তাঁর প্রাসাদ। সোনারগাঁয়ের ইছাপাড়া মৌজার খাসনগর দিঘীর পাশে মুঘল স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত দু'টি পুরোনো ইমারতের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। একটি সোনারগাঁয়ের প্রবেশদ্বার। অপরটি বড় সরদারবাড়ি।' সোনারগাঁ প্রসঙ্গে ঈসা খাঁর সম্পর্কের

বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। আমার ধারণা ঈসা খাঁর জীবন কথা এখানে প্রগাঢ় তিমিরে ঢাকা পড়ে আছে।

প্রজাতন্ত্রী দক্ষিণ কোরিয়া'র ইয়াংওয়ান করপোরেশন কর্তৃক বড় সরদারবাড়ির রেস্টোরেশন কাজ সমাপ্তির পর এটি একটি ঐতিহাসিক স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন হিসেবে প্রতিভাত হবে। বাংলার প্রাচীন রাজধানীর স্পর্শনাতীত কালচারাল হেরিটেজের মায়াবী আকর্ষণে অনুসন্ধিৎসু দেশি-বিদেশি পর্যটক এই ভবনটিতে একই সাথে এদেশে বিদ্যমান প্রাক ইসলামী, মুঘল স্থাপত্য অলঙ্করণশৈলী, বার ভূঁইয়ার স্থাপত্য অলঙ্করণশৈলী, ব্রিটিশ কলোনিয়াল স্থাপত্যশৈলী এবং হিন্দু স্থাপত্যশৈলীর সংমিশ্রণে নির্মিত মনোলোভা স্থাপত্য নিদর্শনের জৌলুস পুনরায় অবলোকন করতে পারবেন। বাংলার প্রাচীন রাজধানীর ঐতিহ্যিক স্থাপত্যশৈলী পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে এর ভৌত অবকাঠামো ফিরিয়ে আনার পর রাজকীয় জীবন-ধারাকে মানসপটে উপস্থাপিত করা। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে Government of Bangladesh has taken the initiative to restore the heritage sites across the country. So that foreign tourists could be attracted to visit these sites in Bangladesh.

আলোচিত রেস্টোরেশন কাজ সম্পর্কে ইয়াংওয়ান করপোরেশনের চেয়ারম্যান ও কোরিয়া ইপিজেড-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক ও শিল্পপতি মি. Kihak Sung বলেন, 'This project will involve substantial research and analysis to bring back the restoration work of the Baro Sardar Bari as much as possible to its original beauty and splendour.'

বড় সরদারবাড়ির আঙিনায় ভ্রমণ করলে মুঘল আমল থেকে ঔপনিবেশিক শাসনামলের অনুভূতি পাওয়া যাবে বলে গভীর প্রতীতি। বড় সরদারবাড়ি রেস্টোরেশন-পুনরুদ্ধার প্রকল্প বাস্তবায়ন একটি প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। সুলতানি আমলের পথ ধরে মুঘল আর সর্বশেষ ব্রিটিশ রাজত্বের ইতিহাস-ঐতিহ্যের ধারক বড় সরদারবাড়ি নির্মাণ করেছিলেন ঐশ্বর্যকান্ত সাহা সরদার বা বড় সরদার নামে একজন ব্যবসায়ী। তখন থেকেই এই ভবনটির পরিচিতি বড় সরদারবাড়ি হিসেবে। ভবনটি নির্মিত হয়েছে ছোট ছোট পাতলা জাফরি ইট, বারান্দা ঘেরা ওঠান, উপরে ত্রিভূজাকৃতির দেয়াল, নীচে অষ্টভূজ পিলারে। যার দেয়ালের পরতে পরতে সুক্ষ্ম কারুকাজ, চুনসুরকির আভ্যন্তরে দাঁড়িয়ে আছে ইতিহাসের স্বাক্ষী হয়ে। কালের বিবর্তনে ভবনটির নাম বদলিয়ে এখন হয়েছে বড় সরদারবাড়ি।

ইতিহাসের এই অমূল্য সম্পদের চেহারা ফিরিয়ে দিতে কাজ করছে কোরিয়া ভিত্তিক বহুজাতিক কোম্পানি ইয়াংওয়ান করপোরেশন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আপনরূপে দেশবাসীর কাছে উন্মোচিত হবে বড় সরদারবাড়ির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। এর মাধ্যমে আমাদের অতীত ইতিহাস-ঐতিহ্যের সঙ্গে নতুন প্রজন্মের মেলবন্ধন সৃষ্টি হবে। একই সাথে প্রাচুর্যময় আভিজাত্য ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ পীঠস্থানকে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কাছে উপস্থাপনের রাজসিক দ্বার উন্মুক্ত হবে।

একনজরে লোককরুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৫ এবং উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান

সোনারগাঁও বাংলাদেশের হাজার বছরের প্রাচীন, প্রাচুর্যময় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও লোক সংস্কৃতির এক গৌরবোজ্জ্বল পীঠস্থান। এক মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে সোনারগাঁয়ের অবস্থান। এদেশের লোকশিল্প ও লোকজ ঐতিহ্য বিকাশের সমৃদ্ধ জায়গা সোনারগাঁও। এদেশের লোককারুশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও পুনরুজ্জীবন বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রথম আর্থিক সাহায্য ও সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে এদেশের মাটি ও মানুষের শিল্পী শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনকে এ ফাউন্ডেশন পরিচালনার দায়িত্ব দেন। ১৯৭৫ সালের ১২ মার্চ একটি প্রজ্ঞাপন বলে সরকার বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে।

লোক ও কারুশিল্প আমাদের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ ও অতীত ঐতিহ্যের এক মূর্ত প্রতীক। দেশের প্রবহমান ঐতিহ্য ও লোকসংস্কৃতির অনুষঙ্গের সাথে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের পরিচিত করার প্রত্যয়ে কারুশিল্পীদের সৃষ্টিশীল কর্মের প্রদর্শন এবং দেশীয় সংস্কৃতির উজ্জীবনে প্রতিবছর ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে মাসব্যাপী লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসবের বর্ণাঢ্য আয়োজন করা হয়। অতীত ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় লোকজ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে উপস্থাপন করা মেলা ও লোকজ উৎসবের অন্যতম উদ্দেশ্য। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন তাৎপর্যের দিক থেকে বাংলাদেশেরই ক্ষুদ্রাকার অবয়ব বলা চলে। এখানে রূপসী বাংলাদেশের অপরূপ প্রতিচ্ছবি প্রত্যক্ষ করা যায়। এ ফাউন্ডেশন প্রতিনিধিত্ব করছে হাজার বছরের লোক মানুষের পরম্পরাগত সভ্যতা ও সংস্কৃতির। ঐতিহ্যের ক্রমপঞ্জিত ধারায় ফাউন্ডেশনের মেলা ও লোকজ উৎসব এখন একটি প্রতিষ্ঠিত মিলন মেলায় পরিণত হয়েছে।

১ মাঘ-২ ফাল্গুন ১৪২১ বঙ্গাব্দ, ১৪ জানুয়ারি থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আয়োজিত মাসব্যাপী লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসব; ১৪ জানুয়ারি সকাল ১১-০০ ঘটিকায় ফাউন্ডেশনের সোনারতরী লোকজ মঞ্চে শুভ উদ্বোধন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, এমপি মেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৫ এর উদ্বোধন করে বলেন, রাজনীতি সংস্কৃতিরই একটি অংশ। সুন্দর একটি দেশ গড়ার জন্য আমরা সাংস্কৃতিক আন্দোলন করছি। আমরা যে ধরনের মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি তা শুদ্ধ সংস্কৃতির মাধ্যমেই সম্ভব। বর্তমানে শিশুদের ওপর জিপিএ-৫ নির্যাতন চালানো হচ্ছে। একটি ক্লাসে সবাই প্রথম হয় না। তাই বলে যারা জিপিএ-৫ না পায় তারা কি মেধাহীন। তাদের কাঁধে বইয়ের বোঝা ঝুলিয়ে দেয়া হচ্ছে। শিশুরা এখন ফুল, পাখি, নদী, প্রকৃতির কাছে যেতে পারছে না। শিশুদের যদি প্রশ্ন করা হয় মুরগি কোথায় আছে? তাহলে সে বলবে মুরগি ফ্রিজে আছে। এর কারণ হচ্ছে তাদেরকে বাইরের জগতের কিছুই দেখানো হচ্ছে না। শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে প্রকৃত মানুষ হওয়া যায় না। প্রকৃত মানুষ হতে হলে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শুধু জয় বাংলা স্লোগান দিলেই সব হয়ে যায় না। জয় বাংলা হৃদয়ে ধারণ করতে হবে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো প্রকৃত দেশপ্রেমিক হতে হবে। শুধু স্লোগান দিয়ে দায় সারলে হবে না। জয় বাংলা কোন দলীয় স্লোগান নয়, এ স্লোগান সার্বজনীন। বাংলাদেশের কৃষিতে আমদের অগ্রগতি হচ্ছে, শিক্ষাতে অগ্রগতি হচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবায় অগ্রগতি হচ্ছে, বিদ্যুৎ সমস্যা কেটে যাচ্ছে। দেশটাকে মধ্যবর্তী আয়ের দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে আমরা প্রায় কাছাকাছি চলে গেছি। তবে আর একটি মূল লড়াইয়ের জায়গা হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতি।'

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পার্টির যুগ্ম মহাসচিব ও নারায়ণগঞ্জ-৩ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য লিয়াকত হোসেন খোকা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. রণজিৎ কুমার বিশ্বাস এনডিসি, নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক আনিসুর রহমান মিঞা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সাজ্জাদুর রহমান, সোনারগাঁ উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এ্যাডভোকেট সামসুল ইসলাম ভূঁইয়া, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান কালাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপ।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সোনারগাঁ উপজেলা নির্বাহী অফিসার আবু নাছের ভূঁঞা, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান শাহ আলম রূপন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নাছিমা আক্তার, নারায়ণগঞ্জ জেলা জাতীয় পার্টির যুগ্ম আহ্বায়ক আলী হুসেইন, সোনারগাঁ উপজেলা মহিলা আওয়ামী লীগ নেত্রী নূরজাহান বেগম, সোনারগাঁ উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার সোহেল রানাসহ আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী এবং বিভিন্ন শ্রেণিপেশার হাজারো মানুষ। অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, এখানে যারা উপস্থিত আছেন তাদের ক'জন বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী পড়েছেন, তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছেন। রাজনীতির বাইরেও বঙ্গবন্ধুর একটি ব্যক্তি জীবন ছিল। আমাদের জানতে হবে তিনি কেমন মানুষ ছিলেন। তিনি বলেন, জয় বাংলা বলে দেশ স্বাধীন হয়েছে। জয় বাংলা কোনো দলীয় স্লোগান নয়। বঙ্গবন্ধু কোনো দলের নয়। তিনি বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা। তাই আমাদের মূল লড়াইয়ের জায়গা কিন্তু সংস্কৃতি। সংস্কৃতির মধ্যে রাজনীতি, অর্থনীতিসহ সার্বিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

তিনি বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্যে বলেন, 'এটি বাঙালি জাতির জন্য গর্বের সম্পদ। এটি আমাদের ধারণ করতে হবে, রক্ষা করতে হবে। বক্তব্য শেষে তিনি ফাউন্ডেশনের সোনারতরী লোকজ মঞ্চে পরিবেশিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। এরপর মাননীয় মন্ত্রী ও অতিথিবৃন্দ মেলায় কর্মরত কারুশিল্পীদের স্টল ঘুরে দেখেন। এর পূর্বে তিনি ফাউন্ডেশনের লাইব্রেরির বিপরীতে লোকজীবনের জীবন্ত প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন।'

মাসব্যাপী মেলা ও লোকজ উৎসবের সাজসজ্জা

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন অঙ্গনে প্রবহমান পরম্পরাগত ঐতিহ্য ও লোক-সংস্কৃতির উপাদানের সাথে পর্যটকগণের পরিচিত করার প্রয়াসে এবং ঐতিহ্যবাহী লোকসংগীত, বাঙালি সংস্কৃতির লালন, বিলুপ্তপ্রায় গ্রামীণ খেলাধুলার প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে মাসব্যাপী লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৫ আয়োজন করা হয়। এই মেলা ও লোকজ উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে ফাউন্ডেশন প্রাঙ্গণ বর্ণিল ও বর্ণালী সাজে সজ্জিত করা হয়। ফাউন্ডেশনের প্রধান ফটকের দু'দিকে বিশাল আকৃতির ফেস্টুন স্থাপন করা হয়। ফাউন্ডেশনের সবুজ চত্বরে স্থাপিত সংগ্রাম প্রতীকের তীরঘেঁষে নির্মিত হয় মাসব্যাপী লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৫-এর মূল তোরণ। এবারের তোরণ সজ্জিত করা হয় একতারা হাতে বাউল ও ঢোলবাদকের প্রতিকৃতি দিয়ে। এটি মাসব্যাপী মেলা ও লোকজ উৎসবের প্রধান তোরণ হিসেবে বিবেচিত হয়। তোরণ দু'টি মাসব্যাপী লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৫ পরিদর্শনে আগত দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করেছে।

শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর এবং প্রশাসনিক ভবনের মধ্যভাগে স্থাপিত বর্ণিল কাগজের তৈরি ময়ূর পর্যটকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। মেলা পরিদর্শনে আগত অনেককেই ময়ূরের সাথে ছবি তুলতে দেখা গেছে। এ বছর মেলা চত্বর বর্ণাঢ্য সাজে সাজানো হয়।

ফাউন্ডেশনর প্রশাসনিক ভবনের সম্মুখভাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিশাল আকৃতির ছবি ডিজিটাল বাঁধাই করে প্রদর্শিত হয়। শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর, প্রশাসনিক ভবন এবং শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘরের দেয়ালে ফাউন্ডেশনের পরিচালক

রবীন্দ্র গোপ-এর 'বাঙালির অপরনাম শেখ মুজিবুর রহমান' এবং 'শীতের নিমন্ত্রণে' শীর্ষক কবিতা সংবলিত দুটি ফেস্টুন প্রদর্শিত হয়। শেখ রাসেল ভাস্কর্যের তীরঘেঁষে নতুন একটি গেইট নির্মিত হয়। এতে ঐতিহাসিক সোনারগাঁয়ের তৈরি এক কাঠের চিত্রিত হাতি ঘোড়া ও পুতুলের চিত্র প্রদর্শিত হয়।

লোকজ উৎসব উপলক্ষে লোকশিল্প জাদুঘর থেকে ফাউন্ডেশনের কারুপল্লী পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জায় লাল-সবুজের বর্ণাঢ্য ব্যানার ও ফেস্টুন ছিল। কিছু ফেস্টুনে চিরায়ত লোক-ঐতিহ্যে বিষয়াবলি সংবলিত শ্লোক, প্রবাদবাক্য, খনারবচন এর পঙ্‌ক্তিমালা প্রদর্শিত হয়। এছাড়া প্রশাসনিক ভবনে আঙিনা থেকে মেলার মাঠের দিকে রাস্তার দু'পাশে লোকজীবনের চিত্রকর্ম প্রদর্শিত হয়।

মাসব্যাপী লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আলপনা অঙ্কিত ফেস্টুনে উপদেশাবলীর পঙ্‌ক্তিমালা থেকে মেলা ও লোকজ উৎসব পরিদর্শনে আগত পর্যটকগণ আমাদের সমৃদ্ধময় অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পেরেছেন। ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ নতুন প্রজন্মকে দেশীয় সংস্কৃতির উপাদানের সাথে পরিচিত করার ব্যবস্থা করেছে। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের আবক্ষ ভাস্কর্যের পুষ্পউদ্যানে আলোকসজ্জা করা হয়। এতে লাল-সবুজ, নীল বাতি দিয়ে মালার মতো করে জড়িয়ে দেয়া হয় প্রসাশনিক ভবন ও লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর ভবনের ইটের তৈরি দেয়াল। সন্ধ্যা নামতে নামতেই আলো আঁধারের লুকোচুরি খেলায় মেতে ওঠে এই বিশেষ আলোকসজ্জা। একই সাথে নানা রকম আলপনা অঙ্কিত ফেস্টুন প্রদর্শিত হয়। ফাউন্ডেশন অঙ্গনের সবুজ চত্বরে স্থাপিত মাটির মটকায় আলপনা অঙ্কিত করে তা ডাস্টবিন হিসেবে ব্যবহারের সু-ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া ফাউন্ডেশনের দৃষ্টিনন্দন লেকের মধ্যভাগের দ্বীপেও রং-বেরঙের ব্যানার দিয়ে সজ্জিত করা হয়।

মাসব্যাপী লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্সের গাছের গোড়ায় রঙ দেয়া হয় এবং এর উপরে লাল-সবুজের গোলাকার বৃত্ত দিয়ে আকর্ষণীয় করা হয়। সাতরং পিকনিক স্পটের সম্মুখের দেয়ালে এবং ডাক বাংলোর দেয়ালে লোকজ আঙ্গিকে বিভিন্ন নকশায় নতুনভাবে আলপনা, মূর‍্যাল অংকন করা হয়। এসব আলপনা, মূর‍্যাল অবলোকনে দর্শকগণ মুগ্ধ হয়েছেন বলে অনুসন্ধানে জানা যায়। ফাউন্ডেশনের লাইব্রেরি ভবনের ডানদিকে পুরাতন ব্রিজ সম্প্রসারণ করে তার ওপর বাঁশের ছাউনি দিয়ে নতুন আঙ্গিকে সাজান হয়। আবহমান বাংলার দোচালা ঘরের আদলে স্থাপিত এ বাঁশের ছাউনি শেড হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং বাঁশের মোটিফে নির্মিত ব্রিজটি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে জানা যায়। লোকজ স্থাপত্যের আদলে তৈরি এ ছাউনির ডানদিকে লেকের তীর ঘেঁষে 'গ্রাম্য সালিশ', 'গায়ে হলুদ', 'পালকিতে বরযাত্রা', 'জামাইকে পিঠা খাওয়ানো' এবং 'কনে দেখা' শীর্ষক পাঁচটি লোকজীবন ভিত্তিক চিত্রকর্ম প্রদর্শনীর বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। এতে ফেস্টুন অঙ্কিত চিত্রকর্মের সম্মুখে সোনারগাঁ উপজেলার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশনায় গ্রামীণ জীবনের চালচিত্র প্রদর্শিত হয়। এছাড়া ফাউন্ডেশনের মেলার মাঠের মধ্যভাগে প্যাভেলিয়নে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্পীদের সমন্বয়ে কর্মরত কারুশিল্পী প্রদর্শনীর এক বিশেষ আয়োজন করা হয়।

বিলুপ্তপ্রায় ঐতিহ্যকে আবিষ্কার করা, কারুশিল্পী ও শিল্পকে লোক সম্মুখে তুলে ধরা, কৃতী কারুশিল্পীদের কাজের প্রেরণা জাগানো, সর্বোপরি লোক ও কারুশিল্পের উপাদানের পুনরুজ্জীবিত করা ফাউন্ডেশনের 'কর্মরত কারুশিল্প প্রদর্শনীর অন্যতম উদ্দেশ্য। এ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কারুশিল্পীদের কর্মময় পরিবেশ এ প্রদর্শনীর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়।

কর্মরত কারুশিল্পী প্রদর্শনী

বাঙালি জীবন ধারার হৃদস্পন্দন দেশের ঐতিহ্য, লোকশিল্প ও সংস্কৃতি। সময়ের চাকা বেয়ে অনেক ঐতিহ্য আজ বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে উপনীত। লুপ্তপ্রায় ঐতিহ্য পুনরায় আনয়ন করে সোনার বাংলাকে ভরিয়ে তুলতে মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলার আয়োজন। বাংলাদেশের বিভন্ন অঞ্চলের অবহেলিত কারুশিল্পীর সৃজনশীল ও সৃষ্টিধর্মী শিল্পকর্মকে 'কর্মরত কারুশিল্পী' প্রদর্শনী কর্মসূচির আওতায় উপস্থাপন করা

ফাউন্ডেশনের মাসব্যাপী লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্যের আলোকে প্রতিবছর বিশেষ ব্যবস্থায় ফাউন্ডেশনের মেলা প্রাঙ্গণে 'আর্টিজান এ্যাটওয়ার্ক' তথা 'কর্মরত কারুশিল্পী' প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় এ বছর নিম্নোক্ত কর্মরত কারুশিল্পী তাঁদের সৃষ্টিশীল পণ্য সামগ্রী নিয়ে এ মিলনমেলায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। মাসব্যপী মেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৫ এ অংশগ্রহণকারী শিল্পীর তালিকা : শ্রী সুশান্ত কুমার পাল, মৃত্যুঞ্জয় পাল, সঞ্জয় কুমার পাল শখের হাঁড়িশিল্প, রাজশাহী; শ্রী পরেশচন্দ্র দাস ও শ্রী রাজকুমার দাস, বেতশিল্প, সোনারগাঁও; জনাব মো. আবুল কালাম ও মনোয়ারা বেগম তালপাতার হাতপাখাশিল্প, চট্টগ্রাম; শ্রী দীপন কর্মকার ও কৃষ্ণ কর্মকার লোহাশিল্প, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ; জনাব মোহাম্মদ আলী ও আবদুল্লাহ জামদানিশিল্প সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ; শ্রী শংকর মালাকার ও রাম প্রসাদ মালাকার, শোলার কারুশিল্প, মাগুরা; শ্রী বীরেন্দ্র চন্দ্র সূত্রধর, দিপালী রাণী সূত্রধর, শ্রী আশুতোষ চন্দ্র সূত্রধর, সন্ধ্যারাণী সূত্রধর, কাঠের চিত্রিত হাতি ঘোড়া শিল্প, সোনারগাঁও নারায়ণগঞ্জ; জনাব হোসনে আরা বেগম ও নার্গিস আক্তার, নকশি কাঁথা, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ; শ্রমতি সবিতা রাণী মোদি ও কৃষ্ণ চন্দ্র মোদি, শীতল পাটিশিল্প, মুন্সিগঞ্জ; জনাব মো. রমজান আলী ও রেজিয়া বেগম, শতরঞ্জিশিল্প রংপুর; শ্রী তপন কুমার মালাকার মুখোশচিত্র শিল্প, রাজশাহী; জনাব মানিক সরকার ও জনাব আব্দুস সাত্তার তামা-কাঁসা-পিতল শিল্প কুমিল্লা; জনাব মো. কাইফু ও রানু বেগম পাপোষশিল্প রংপুর, জনাব একাব্বর আলি ও ফিরোজা বেগম পাটের ব্যাগ ও পাপোষশিল্প রংপুর; শ্রী সুনিল চন্দ্র পাল ও আরতি রাণী পাল, টেপাপুতুল শিল্প, কিশোরগঞ্জ; জনাব শিউলি খানম ও জয়শ্রী ধর, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বস্ত্রশিল্প, রাঙ্গামাটি; জনাব মো. আব্দুল আউয়াল মোল্লা ও রফিকুল ইসলাম, দারুশিল্প সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ; শ্রী গোপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী শোলাশিল্প, ঝিনাইদহ; শ্রী সুধন্য চন্দ্র দাস, রামু চন্দ্র দাস, সরাচিত্র, নারায়ণগঞ্জ; জনাব ডেভিড বম, জেমস্ বম, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর তাঁতশিল্প, বান্দরবান; মিসেস লাকী ইমরান ও মো. সোহেল পাটজাত শিল্প, সোনারগাঁও; শামীম হোসাইন ও আল আমিন কাগজের তৈরি কারুপণ্য, ঢাকা; রঘুনাথ চক্রবর্তী ও নমিতা চক্রবর্তী পাটচিত্রশিল্প, ঢাকা। সর্বমোট ৪৭ জন কারুশিল্পীর কর্মময় পরিবেশ উপস্থাপনের মাধ্যমে ২৩টি স্টলে তাদের পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের সৃজনশীল প্রদর্শনী পর্যটকগণের কাছে তুলে ধরা হয়।

মেলার স্টল বিন্যাস

ফাউন্ডেশন আয়োজিত মাসব্যাপী লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কারুশিল্পজাত পণ্যাদি বিক্রয়ের জন্য মেলার স্টল নিম্নোক্তভাবে বিন্যাস করা হয় : ক-গ্রুপ : হস্তশিল্পের ৪৮টি, খ-গ্রুপ : পোশাক শিল্পের ৪১টি, গ-গ্রুপ : স্টেশনারি ও কসমেটিক্স ৩৬টি, ঘ-গ্রুপ : খাবার ও চটপটির স্টল-১৯টি, ঙ-গ্রুপ : মিষ্টির স্টল ১৬টি, কারুশিল্পীর কারুপণ্য প্রদর্শনীর স্টল ২৩টি, সর্বমোট ১৮৩টি স্টল তৈরি করা হয়। কারুপল্লীতে ৩৫টি স্টলেও রকমারি পণ্যাদি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া বিক্রয় কেন্দ্রেও বাহারি পণ্যের পসরা বসে।

লোকজ উৎসবের অনুষ্ঠানমালা

আমাদের হাজার বছরের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের স্মারক লোকসঙ্গীত বাংলার চিরায়ত শিল্প। তাই লোকসঙ্গীতের আবেদন চিরন্তন। বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতের মূলে রয়েছে মাটির ছোঁয়া। মাটির মানুষের হৃদয়ের কথকথা লোকসঙ্গীতে প্রতিফলিত হয়। এদেশের লোকসঙ্গীত গণমানুষের হৃদয়লোক থেকে উঠে আসে। হৃদয় লোকেই তার আবেদন। লোকসঙ্গীত বাংলাদেশের লোকজ ঐতিহ্য। এ ঐতিহ্যে মানুষের মনের কথা, প্রাণের স্পর্শ আর হৃদয়ের আর্তি মিশে আছে। লোকজ উৎসবের মাসব্যাপী আয়োজনে দেশের জনমানুষের হৃদয় স্পন্দন জাগাতে এবং বাংলার লোক ঐতিহ্যের অনন্য উপাদানের সাথে নতুন প্রজন্মকে পরিচিত করার প্রয়াসে ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে মাসব্যাপী লোকজ উৎসব ২০১৫ উপলক্ষে নানা ধরনের অনুষ্ঠানমালা পরিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়।

আমাদের আছে জারি-সারি, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, মুর্শিদি, লালনগীতি, বাউলগান, মাইজভান্ডারী, গম্ভীরা, আলকাপ এবং হাছন রাজার মতো হাজারো লোকসঙ্গীতের ভাণ্ডার। লোকজ উৎসবের মাসব্যাপী আয়োজনে প্রতিদিন সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের সমৃদ্ধ লোকসঙ্গীতের ভাণ্ডার থেকে বাউলগান, পালাগান, নাটক, লোকজসঙ্গীত, নৃত্যনাট্য, কবিতা আবৃত্তি, লোক ছড়াপাঠের আসর, লোকজ গল্প বলা বর্ণিল ও বর্ণালী অনুষ্ঠানমালা 'সোনারতরী' লোকজমঞ্চে পরিবেশিত হয়। মাসব্যাপী লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৫ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার বিবরণ নিম্নরূপ :

পহেলা মাঘ বুধবার ১৪২১ বঙ্গাব্দ ॥ ১৪ জানুয়ারি ২০১৫ :

মাসব্যাপী লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসবের শুভ উদ্বোধনী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দিনব্যাপী আয়োজনে কবি আফরোজা কণার সঞ্চালনায় লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বনামধন্য শিল্পী কিরণচন্দ্র রায়, অনিমা মুক্তি গমেজ, ছোট খালেক দেওয়ান, শিল্পী মধু প্রমুখ। নারায়ণগঞ্জের অর্চনা একাডেমীর শ্রী সঞ্চয় ভৌমিকের পরিচালনায় লোকজ নৃত্য এবং ছোট্ট সোনামণিদের গান পরিবেশিত হয়। উল্লেখ্য যে, এদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যন্ত্রসংগীতে সহযোগিতা করেন কিবোর্ডে-পীযুষ ইসলাম, প্যাডে-বাপ্পী, বাঁশিতে শফিকুর রহমান শুভ, তবলায় রবি রায়, দোতারায়-সোলাইমান এবং ঢোলকে রাজকুমার। এছাড়া সং সাজায় ছিলেন আবদুর রহমান এবং সোলাইমান। এদিন গ্রামীণখেলা পরিচালনা করেন মো. আবদুল কাদির এবং লোকজীবন প্রদর্শনীতে ছিলেন বুলবুল ইসলাম। বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

২ মাঘ বৃহস্পতিবার ১৪২১ বঙ্গাব্দ ॥ ১৫ জানুয়ারি ২০১৫ :

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন আয়োজিত মাসব্যাপী লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসবের দ্বিতীয়দিনের বৈকালিক আয়োজনে আইনাল হক বাউল ও ঝর্ণা সরকার বাউল গান পরিবেশন করেন। সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে সোনারগাঁয়ের মনির প্রবাসী ও তারদল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থাপন করেন। বিপুলসংখ্যক দর্শক অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

৩ মাঘ, শুক্রবার ১৪২১ বঙ্গাব্দ ॥ ১৬ জানুয়ারি ২০১৫ :

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন আয়োজিত মাসব্যাপী মেলা ও লোকজ উৎসবের ধারাবাহিকতায় দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালায় সং সাজা, গ্রামীণ মেলা, লোকজীবন প্রদর্শনী, বাউলগান ও সাস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে ফাউন্ডেশনের প্রদর্শনীতে নির্ধারিত লোকজীবন বৈদ্যেরবাজার পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের ড্রেস মেকিং এবং হিসাব বিজ্ঞান শিক্ষক তানিয়া আক্তারের উপস্থাপনায় ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশনায় 'গ্রাম্য সালিশ', 'গায়ে হলুদ', 'পালকিতে বর যাত্রা', 'জামাইকে পিঠা খাওয়ানো এবং কনে দেখা' শীর্ষক ৫টি লোকজীবন ভিত্তিক চিত্রকর্ম প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এরপর একই স্কুলের শিক্ষক বশির উদ্দিনের পরিচালনায় লুপ্তপ্রায় গ্রামীণ খেলা পরিবেশিত হয়।

ফাউন্ডেশনের সোনারতরী লোকজমঞ্চে বাউলগানের আসরে হীরু ফকির, মিনা পাগলী লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিল্পী জাহিন এর অংশগ্রহণে ঢাকা থেকে আগত সপ্তঋষি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী পরিবেশিত লোকসঙ্গীত উপস্থাপিত হয়। বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

৪ মাঘ, শনিবার ১৪২১ বঙ্গাব্দ ॥ ১৭ জানুয়ারি ২০১৫ :

ফাউন্ডেশনের মাসব্যাপী মেলা ও লোকজ উৎসবের সমারোহপূর্ণ আয়োজনে দেশীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে লুপ্তপ্রায় গ্রামীণখেলা উপস্থাপন করা হয়। এ উপলক্ষে সম্মানদী হাসান খান উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে ইয়াছিন খানের তত্ত্বাবধানে ফাউন্ডেশনের খেলার মাঠে গ্রামীণখেলা অনুষ্ঠিত হয়। বৈকালিক বাউলগানের আসরে শিল্পী গোলাপী, রিতা

সাহা, পীযুষ ইসলাম বাউলগান পরিবেশন করেন। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তনুশ্রী সাহার উপস্থাপনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

৫ মাঘ, রবিবার ১৪২১ বঙ্গাব্দ ॥ ১৮ জানুয়ারি ২০১৫ :

মাসব্যাপী লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৫-এর ৫মদিনে সোনারগাঁ কিন্ডার গার্টেনের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশনায় গ্রামীণ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ক্রীড়া শিক্ষক ইসমত আরা বেগম গ্রামীণ খেলা পরিচালনা করেন।

বৈকালিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সোনারতরী লোকজ মঞ্চে হাসি সরকার, বাউল করিম লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে লন্ডন প্রবাসী শিল্পী মামুন ও তার দল মনোজ্ঞ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

৬ মাঘ, সোমবার ১৪২১ বঙ্গাব্দ ॥ ১৯ জানুয়ারি ২০১৫ :

মাসব্যাপী লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসবের নির্ধারিত অনুষ্ঠানমালায় কাঁচপুর ওমর আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশনায় বিলুপ্তপ্রায় গ্রামীণ প্রদর্শিত হয়। এতে ক্রীড়া শিক্ষক মনোয়ার হোসেন আলোচিত খেলা পরিচালনা করেন। বৈকালিক বাউলগানের আসরে সাদিয়া আজমেরী, লুতু সরকার বাউলগান পরিবেশন করেন। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সুরতাল সঙ্গীত একাডেমী পরিবেশিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থাপিত হয়। অনুষ্ঠানটির সার্বিক সঞ্চালনায় ছিলেন মো. ফয়জুল বারী।

৭ মাঘ, মঙ্গলবার ১৪২১ বঙ্গাব্দ ॥ ২০ জানুয়ারি ২০১৫ :

মাসব্যাপী মেলা ও লোকজ উৎসবে প্রতিদিনের ধারাবাহিকতায় বৈকালিক বাউলগানের আসরে জব্বার দেওয়ান ও রওশন তালুকদার একক বাউলগান পরিবেশন করেন। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পালা গান পরিবেশন করেন সামসু দেওয়ান ও তার দল এবং নীলা পাগলা ও তার দল 'হাশর ও কিয়ামত' শীর্ষক পালাগান পরিবেশন করেন।

৮ মাঘ, বুধবার ১৪২১ বঙ্গাব্দ ॥ ২১ জানুয়ারি ২০১৫ :

ফাউন্ডেশন আয়োজিত মাসব্যাপী মেলা ও লোকজ উৎসবে প্রতিদিনের ধারাবাহিক অনুষ্ঠানে লুপ্তপ্রায় গ্রামীণ খেলা ও লোকজ উৎসবে প্রতিদিনের ধারাবাহিক অনুষ্ঠানে-লুপ্তপ্রায় গ্রামীণ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ক্রীড়া শিক্ষক কাজী মোশাররফ হোসেন গ্রামীণ খেলা পরিচালনা করেন। বৈকালিক অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ করেন শাসসুদ্দোহা চৌধুরী, কবি রেজা ফারুক প্রমুখ। এরপর সোনারতরী লোকজ মঞ্চে রুবি সরকার ও তার দল লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ প্রগতিশীল শিল্পীগোষ্ঠী পরিবেশিত লোকসঙ্গীত উপস্থাপিত হয়। এতে শিল্পী অর্পিতা মিত্র লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন।

৯ মাঘ, বৃহস্পতিবার ১৪২১ বঙ্গাব্দ ॥ ২২ জানুয়ারি ২০১৫ :

মেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৫-এর প্রতিদিনের অনুষ্ঠানমালার ধারাবাহিকতায় সোনারবাংলা উচ্চ বিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক ইসমাইল হোসেন খানের পরিচালনায় গ্রামীণ খেলা প্রদর্শিত হয়।

বৈকালিক একক বাউল গানের আসরে ফাউন্ডেশনের সোনারতরী লোকজ মঞ্চে ডলার বাউল শিল্পী ডেইজী প্রমুখ লোকজসঙ্গীত পরিবেশন করেন। এরপর আরজত আলি স্মৃতি কল্যাণ পাঠাগার এর পক্ষে সাদিকুল আলমের পরিচালনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জিএম রহমান রনি'র পরিচালনায় সুরমুঞ্জরী সাংস্কৃতিক শিল্পী গোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ মনোজ্ঞ লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন। অগণিত দর্শক ফাউন্ডেশনের অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

১০ মাঘ, শুক্রবার ১৪২১ বঙ্গাব্দ ॥ ২৩ জানুয়ারি ২০১৫ :

মাসব্যাপী লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৫ ১০ম দিনের বৈকালিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ফাউন্ডেশনের সোনারতরী লোকজ মঞ্চে আলম দেওয়ান ও তার দল, শিল্পী ডেইজী, ওস্তাদ সোলাইমান প্রমুখ লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন। যন্ত্রসঙ্গীতে ছিলেন কিবোর্ডে পীযুষ ইসলাম, পাডে আকাশ, বাঁশিতে শুভ, ঢোলে রাজকুমার, হারমনিয়ামে মোখলেছুর রহমান, খঞ্জনীতে মোমেন। এ দিন সঙ সাজায় ছিলেন ছোলেমান এবং আঃ রহমান। তারা বিচিত্র ঢঙে সঙ সেজে আগত দর্শনার্থীদের আনন্দ দান করে। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অগ্নিবীনা ললিতকলা একাডেমীর শিল্পীদের পরিবেশনায় লোকসঙ্গীত পরিবেশিত হয়। এরপর বাংলাদেশের স্বনামধন্য শিল্পী আবদুল কুদ্দুস বয়াতি ও তার দলের পরিবেশনায় কাহিনী পালা উপস্থাপিত হয়। অনুষ্ঠানে ফাউন্ডেশনের পরিচালক রবীন্দ্র গোপ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শিল্পীকে উত্তরীও এবং ক্রেস্ট প্রদান করে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

১১ মাঘ, শনিবার ১৪২১ বঙ্গাব্দ ॥ ২৪ জানুয়ারি ২০১৫ :

মাসব্যাপী লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৫-এর নির্ধারিত অনুষ্ঠানমালার অংশ হিসেবে পঞ্চমীঘাট উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজীব কুমার দাসের নেতৃত্বে গ্রামীণ খেলা প্রদর্শিত হয়। বৈকালিক বাউলগানের আসরে শিল্পী আনিসা, ছোট খালেক দেওয়ান এবং অমিয় বাউল ও তার দল লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন। এরপর বহ্নিশিখা শিল্পী গোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আবদুল আলীম লোকগীতি শিল্পীগোষ্ঠী মনোজ্ঞ লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন।

১২ মাঘ, রবিবার ১৪২১ বঙ্গাব্দ ॥ ২৫ জানুয়ারি ২০১৫ :

মাসব্যাপী লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসবের নির্ধারিত অনুষ্ঠানমালায় চৌধুরীগাঁও বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের পরিবেশনায় লুপ্তপ্রায় গ্রামীণ খেলা প্রদর্শিত হয়। এতে ক্রীড়া শিক্ষিকা মিসেস মাহমুদা আক্তার গ্রামীণ খেলা পরিচালনা করেন।

বৈকালিক বাউলগানের আসরে পাপিয়া, সুবল সেন, বাউল পাগল চাঁন প্রমুখ শিল্পী গান পরিবেশন করেন। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাহাউদ্দিন মোহাম্মদ এর নেতৃত্বে সুর সাগর সঙ্গীত একাডেমীর শিল্পীদের পরিবেশনায় লোকসঙ্গীত পরিবেশিত হয়। এরপর শিল্পী অজিত কুমার শীলের উপস্থাপনায় কেয়া শিল্পীগোষ্ঠী-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে।

১৩ মাঘ, সোমবার ১৪২১ বঙ্গাব্দ ॥ ২৬ জানুয়ারি ২০১৫ :

মাসব্যাপী লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসবের নির্ধারিত অনুষ্ঠানমালায় কাইকারটেক উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশনায় লুপ্তপ্রায় গ্রামীণ খেলা প্রদর্শিত হয়। এতে ক্রীড়া শিক্ষক মো. আলমগীর হোসেন খেলা পরিচালনা করেন।

বৈকালিক বাউল গানের আসরে স্বনামধন্য শিল্পী আবদুল হালিম খান, মারিয়া, ফাউন্ডেশনের সোনারতরী লোকজমঞ্চে লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন। এরপর সুরসাথী সঙ্গীত একাডেমির শিল্পীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। উল্লেখ্য যে, জনাব বাহাউদ্দিন আলোচিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিল্পী রণজিৎ কুমার বৈরাগীর উপস্থাপনায় সুরমেলা শিল্পীগোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। বিপুল সংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত লোকজ উৎসবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

১৪ মাঘ, মঙ্গলবার ১৪২১ বঙ্গাব্দ ॥ ২৭ জানুয়ারি ২০১৫ :

মেলা ও লোকজ উৎসবের প্রতিদিনের অনুষ্ঠানমালার ধারাবাহিকতায় এদিন সোনাখালি উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক জনাব মুজিবুর রহমানের পরিচালনায় গ্রামীণ খেলা প্রদর্শিত হয়। এরপর দবির উদ্দিন ভূইয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ গ্রামীণ খেলা পরিবেশন

করে। উল্লেখ্য যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষক জনাব মো. আবদুর রশিদ এ খেলাটি পরিচালনা করেন।

বৈকালিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিল্পী সনৎ কুমার বিশ্বাসের পরিচালনায় গীতাঞ্জলি ললিতকলা একাডেমীর শিল্পীবৃন্দ লোকসঙ্গীত পরিবেশন করে। এরপর সোনারতরী লোকজ মঞ্চে উত্তরবঙ্গের প্রখ্যাত শিল্পী মহসিন আলী ও আবুল কালামের যৌথ পরিবেশনায় আলকাপ গান উপস্থাপিত হয়। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মো. আবদুর রহমান সরকারের উপস্থাপনায় বাউলতরী শিল্পীগোষ্ঠী এক মনোজ্ঞ লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন। বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

১৫ মাঘ, বুধবার ১৪২১ বঙ্গাব্দ ॥ ২৮ জানুয়ারি ২০১৫ :

মাসব্যাপী মেলা ও লোকজ উৎসবের সমারোহপূর্ণ আয়োজনে দেশীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে হোসেনপুর এসপি ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালরে ক্রীড়া শিক্ষক জনাব মোখলেসুর রহমানের পরিচালনায় গ্রামীণ খেলা প্রদর্শিত হয়।

বৈকালিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ফাউন্ডেশনের সোনারতরী লোকজ মঞ্চে সঙ্গীত পরিবেশন করেন চ্যানেল আইএর তিন ঢাকার তারকা শিল্পী ওমর আলী, সরদার রহমতউল্লাহ, শিল্পী ডেইজী, ছোট খালেক দেওয়ান প্রমুখ।

সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সারেগামা সংগীত নিকেতন এর শিল্পীদের পরিবেশনায় এক মনোজ্ঞ লোকসঙ্গীত পরিবেশিত হয়। শিল্পী লিঙ্কন আহমেদ আলোচিত অনুষ্ঠান উপস্থাপন করেন। এরপর জনাব মারজিয়া রহমানের পরিচালনায় বিরোহী শিল্পীগোষ্ঠী লোকসঙ্গীত উপস্থাপন করেন। বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

১৬ মাঘ, বহস্পতিবার ১৪২১ বঙ্গাব্দ ॥ ২৯ জানুয়ারি ২০১৫ :

মাসব্যাপী মেলা ও লোকজ উৎসবের প্রতিদিনের অনুষ্ঠানমালার ধারাবাহিকতায় গ্রামীণ খেলা ও লোক জীবন প্রদর্শনীতে আদমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আবু সাঈদ ও নাজনীন সুলতানার পরিচালনায় বিদ্যালয়ের . ছাত্র/ছাত্রীদের পরিবেশনায় গ্রামীণ খেলা ও লোকজীবনের চালচিত্র উপস্থাপিত হয়।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত শিল্পী বেবী ইসলাম, আবদুল বারেক বয়াতি, শিল্পী পীযুষ ইসলাম, মোখলেছুর রহমান প্রমুখ লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সোনারতরী লোকজ মঞ্চে মনির হোসেন সিকদারের পরিচালনায় বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন। এরপর স্বনামধন্য শিল্পী শারমিন সুলতানার উপস্থাপনায় মন্দিরা শিল্পীগোষ্ঠী এক মনোজ্ঞ লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন। বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

১৭ মাঘ, শুক্রবার ১৪২১ বঙ্গাব্দ ॥ ৩০ জানুয়ারি ২০১৫ :

মাসব্যাপী মেলা ও লোকজ উৎসবের সমারোহপূর্ণ আয়োজনে বাংলাদেশ ও ভারতের স্বনামধন্য কবিদের কবিতা পাঠ উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে সোনারতরী লোকজ মঞ্চে জগতের সকল আঁধার অমঙ্গল বিদূরীত করে জ্বলে উঠুক মঙ্গল প্রদীপ শিখা এ ব্রত নিয়ে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক, ভাষাসংগ্রামী কামাল লোহানী। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট কবি অমৃত মাইতি। সভায় সভাপতিত্ব করেন ফাউন্ডেশনের পরিচালক রবীন্দ্র গোপ।

অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ করেন কবি অশ্বিনী জানা, সুস্নাতা জানা, প্রাণনাথ শেঠ, মানস কুমার চিনি প্রমুখ। এ উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী অনিমা মুক্তি গমেজ, শিল্পী বিশ্বজিৎ ঘোষ, নিপা, ছোট খালেক দেওয়ান, সোলায়মান এবং লালন পাঠশালার ছোট সোনামণিরা।

গ্রামীণ খেলা পরিচালনায় ছিলেন মিজানুর রহমান এবং লোকজীবন প্রদর্শনীতে ছিলেন আবুল কাসেম।

সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জনাব মানস করের পরিচালনায় কিশোরগঞ্জের লোকজ গীতি নৃত্যনাট্য 'সোনাইমাধব' উপস্থাপিত হয়। এরপর ইমন চৌধুরীর পরিচালনায় ফাল্গুনী সামাজিক সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সংস্থার-লোকজ নাটক পরিবেশিত হয়। এরপর স্বনামধন্য শিল্পী মিলনকান্তি দে এর পরিচালনায় 'গঙ্গা থেকে বুড়িগঙ্গা' শীর্ষক যাত্রাপালা উপস্থাপিত হয়। বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

১৮ মাঘ, শনিবার ১৪২১ বঙ্গাব্দ ॥ ৩১ জানুয়ারি ২০১৫ :

মাসব্যাপী মেলা ও লোকজ উৎসবের প্রতিদিনের ধারাবাহিক অনুষ্ঠানমালায় উদয়ন আদর্শ বিদ্যানিকেতন এর শিক্ষক সহিদ আল পারভেজের পরিচালনায় লুপ্তপ্রায় গ্রামীণ খেলা প্রদর্শিত হয়। বৈকালিক বাউলগানের আসরে ফাউন্ডেশনের সোনারতরী লোকজ মঞ্চে বদিয়ার রহমান, জনি সরকার, লতা সরকার প্রমুখ বাউল গান পরিবেশন করেন।

সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সামিনা খন্দকারের উপস্থাপনায় মন্দিরা শিল্পীগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। এরপর আমিনুল ইসলাম শিপনের পরিচালনায় 'গনিয়া তরুণ শিল্পী সংস্থা' এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থাপন করেন।

১৯ মাঘ, রবিবার ১৪২১ বঙ্গাব্দ ॥ ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ :

লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসবের প্রতিদিনের অনুষ্ঠানমালার ধারাবাহিকতায় সোনারগাঁয়ের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'বুরুমদী' এএলএমএইচ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক জনাব আব্দুর গাফফার এর পরিচালনায় ফাউন্ডেশনের খেলার মাঠে গ্রামীণ খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

বৈকালিক 'বাউল গানের আসরে সোনারতরী লোকজ মঞ্চে বকুল দেওয়ান, কলি সরকার, মিজানুর রহমান প্রমুখ লোকগান পরিবেশন করেন।

সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আব্দুল মালেক সিকদারের পরিচালনায় 'তরুণী শিল্পীগোষ্ঠী' এবং রবি রায়ের উপস্থাপনায় সোনারগাঁ শিল্পকলা একাডেমি মনোজ্ঞ লোকসাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

২০ মাঘ, সোমবার ১৪২১ বঙ্গাব্দ ॥ ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ :

মাসব্যাপী লোকজ উৎসবের ধারাবাহিক অনুষ্ঠানমালায় তাজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মোঃ আমীর আলীর পরিচালনায় ফাউন্ডেশনের নির্ধারিত খেলার মাঠে লুপ্তপ্রায় গ্রামীণ খেলা পরিবেশিত হয়।

বৈকালিক বাউলগানের অনুষ্ঠানে সোনারতরী লোকজ মঞ্চে শিল্পী সাধনা মিত্র, শিবু রায়, সেলিম সরকার, ছালমা চৌধুরী প্রমুখ শিল্পীদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ লোকসঙ্গীত উপস্থাপিত হয়। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জনাব মানজারুল ইসলাম চৌধুরীর পরিচালনায় 'সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠী' এবং জনাব সুলতান হোসেন এর পরিচালনায় ঢাকা থেকে আগত 'মাটির সুর সঙ্গীত পরিষদ' এর শিল্পীবৃন্দ লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন।

২১ মাঘ, মঙ্গলবার ১৪২১ বঙ্গাব্দ ॥ ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ :

মেলা ও লোকজ উৎসবের ধারাবাহিক অনুষ্ঠানমালায় জামপুর মাঝের চর এমএসজিকে উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক সখিনা আক্তার এর পরিচালনায় গ্রামীণ খেলা পরিবেশিত হয়।

বৈকালিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্ব-ভূমি লেখন শিক্ষা কেন্দ্র' এর শিল্পী আরিফ রহমানের পরিচালনায় লোকজসাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সোনারগাঁয়ের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সোনারগাঁও ডিগ্রি কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। এরপর সুরের বাঁধন সাংস্কৃতিক সংগঠন এর শিল্পী জালাল উদ্দিনের পরিচালনায় এক মনোজ্ঞ লোকসঙ্গীত পরিবেশিত হয়। বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

২২ মাঘ, বুধবার ১৪২১ বঙ্গাব্দ॥ ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ : মাসব্যাপী লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসবের প্রতিদিনের অনুষ্ঠানমালার ধারাবাহিকতায় কাইকেরটেক জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক মুজিবুর রহমানের পরিচালনায় ফাউন্ডেশনের খেলার মাঠে গ্রামীণ খেলা প্রদর্শিত হয়। বৈকালিক বাউলগানের আসরে স্বনামধন্য শিল্পী বীনা মজুমদার, খোকন সরকার, চমন সরকার প্রমুখের পরিবেশনায় লোকগান পরিবেশিত হয়।

সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নারায়ণগঞ্জ শিল্পকলা একাডেমির শিল্পীদের পরিবেশনায় এক মনোজ্ঞ লোকসঙ্গীত পরিবেশিত হয়। উল্লেখ্য যে, জনাব সালাউদ্দিন অনুষ্ঠানটির সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন। এরপর জনাব আবদুল হালিম খানের সার্বিক সঞ্চালনায় তেজকুনিপাড়া সাংস্কৃতিক সংগঠন সোনারতরী লোকজ মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

২৩ মাঘ, বৃহস্পতিবার ১৪২১ বঙ্গাব্দ ॥ ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ :

শীতের পড়ন্ত বিকেলে ফাউন্ডেশনের গ্রামীণ খেলার মাঠে গোয়ালদি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সাহিবা খাতুনের পরিচালনায় লুপ্তপ্রায় গ্রামীণ খেলা প্রদর্শিত হয়।

বৈকালিক একক বাউলগানের আসরে কবির সরকার, আশা সরকার লোকজ মঞ্চে বাউলগান পরিবেশন করেন। এরপর শ্রী উত্তম কুমার এর সার্বিক সঞ্চালনায় লোকসঙ্গীত পরিবেশিত হয়। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জনাব আতাউর রহমানের পরিচালনায় আড়াই হাজার শিল্পকলা একাডেমীর শিল্পীবৃন্দ এক মনোজ্ঞ লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন। বিপুলসংখ্যক দর্শক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

২৪ মাঘ, শুক্রবার ১৪২১ বঙ্গাব্দ ॥ ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ :

মাসব্যাপী মেলা ও লোকজ উৎসবের প্রতিদিনের অনুষ্ঠানমালার ধারাবাহিকতায় শীতের পড়ন্ত বিকেলে প্রতিষ্ঠানের গ্রামীণ খেলার মাঠে–জনাব মাজহারুল ইসলামের নেতৃত্ব গ্রামীণ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর মরিয়ম আক্তারের পরিচালনায় লোকজীবন প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

বৈকালিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সোনারতরী লোকজ মঞ্চে লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বনামধন্য শিল্পী মধু, শিল্পী প্রাপ্তি, সোলায়মান প্রমুখ। লোকসঙ্গীতের যন্ত্রীদলে ছিলেন তবলায় রবি রায়, কিবোর্ডে বাপ্পী, প্যাডে জীবন, বাঁশিতে শুভ, ঢোলে রাজকুমার প্রমুখ। অনুষ্ঠানটির সার্বিক সঞ্চালনায় ছিলেন কবি আফরোজা কণা। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির পরিচালক জনাব মোশাররফ হোসেনের উপস্থাপনায় এক মনোজ্ঞ দলীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

২৫ মাঘ, শনিবার ১৪২১ বঙ্গাব্দ ॥ ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ :

প্রতিদিনের মতো শীতের পড়ন্ত বিকেলে ফাউন্ডেশনের সোনারতরী লোকজ মঞ্চে স্বনামধন্য শিল্পী ডেইজী ও তার দল লোক সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এরপর সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জনাব এমএ মালেক এর সার্বিক পরিচালনায় লোকজ নাটক পরিবেশিত হয়।

২৬ মাঘ, রবিবার ১৪২১ বঙ্গাব্দ ॥ ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ :

মাসব্যাপী লোকজ উৎসবের অনুষ্ঠানে ফাউন্ডেশনের গ্রামীণ খেলার মাঠে মনিরুজ্জামানের পরিচালনায় গ্রামীণ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। বৈকালিক বাউলগানের আসরে গান পরিবেশন করেন শিল্পী রিতা চৌধুরী, সিদ্দিকুর রহমান, সুজন সাধু প্রমুখ। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জনাব আনোয়ার হোসেনের পরিচালনায় মনোজ্ঞ লোকসঙ্গীতের আসর বসে। বিপুসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশনের লোকজ নাটক উপভোগ করেন।

২৭ মাঘ, সোমবার ১৪২১ বঙ্গাব্দ ॥ ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ :

মাসব্যাপী লোকজ উৎসবের ধারাবাহিক অনুষ্ঠানমালায় এদিন জনাব হাকিমুল আহছানের পরিচালনায় গ্রামীণ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। বৈকালিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিল্পী বিজয়কৃষ্ণ রায় ও তার দল পরিবেশিত লোকসঙ্গীতের আসর বসে। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এসএম জাকির হোসেনের নেতৃত্বে লোকজ নাটক পরিবেশিত হয়। বিপুলসংখ্যক দর্শনার্থী নাটক উপভোগ করেন।

২৮ মাঘ, মঙ্গলবার ১৪২১ বঙ্গাব্দ ॥ ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ :

মেলা ও লোকজ উৎসবের মাসব্যাপী অনুষ্ঠানমালার ধারাবাহিকতায় ফাউন্ডেশনের গ্রামীণ খেলার মাঠে জনাব আবু নাসের মোল্লার পরিচালনায় লুপ্তপ্রায় গ্রামীণ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। বৈকালিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দলনেতা শ্রী গৌতম কুমারের পরিচালনায় এক মনোজ্ঞ লোকজ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থাপিত হয়। বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জনাব সুমন এর পরিচালনায় লোকজ নাটক পরিবেশিত হয়।

২৯ মাঘ, বুধবার ১৪২১ বঙ্গাব্দ ॥ ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ :

মাসব্যাপী লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৫ এর প্রতিদিনের অনুষ্ঠানমালার ধারাবাহিকতায় বৈকালিক বাউলগান পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এ উপলক্ষে ফাউন্ডেশনের সোনারতরী লোকজ মঞ্চে শিল্পী মেজবাহউদ্দিন এবং ভগিরথ মালো বাউলগান পরিবেশন করেন। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জনাব জুয়েল রানার পরিচালনায় 'দুঃখিনী মা' শীর্ষক লোকজ নাটক পরিবেশিত হয়। বিপুলসংখ্যক স্থানীয় দর্শক লোকজ নাটক উপভোগ করেন।

৩০ মাঘ, বৃহস্পতিবার ১৪২১ বঙ্গাব্দ ॥ ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ :

মেলা ও লোকজ উৎসবের মাসব্যাপী অনুষ্ঠানমালার ধারাবাহিকতায় ফাউন্ডেশনের গ্রামীণ খেলার মাঠে মিসেস আমেনা কায়েসের পরিচালনায় গ্রামীণ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। বৈকালিক বাউলগানের আসরে আরজ আলী বয়াতী বাউলগান পরিবেশন করেন। এরপর ঢাকা থেকে আগত আওয়ামী শিল্পীগোষ্ঠীর শিল্পীদের পরিবেশনায় এক মনোজ্ঞ লোকসঙ্গীত পরিবেশিত হয়। উল্লেখ্য যে, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী শিবু রায় অনুষ্ঠানে দেশের গান ও ভাষার গান পরিবেশন করেন। অন্যান্যের মধ্যে গান পরিবেশন করেন আখি আলম, আহমেদ রাজু, সাধনা মিত্র, মোহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ, সালমা চৌধুরী, দেলোয়ার হোসেন প্রমুখ।

সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জনাব মেহেদি হাসান জসিম উদ্দিনের পরিচালনায় 'ইজ্জত পাইলাম না' শীর্ষক লোকজ নাটক পরিবেশিত হয়। বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

১ ফাল্গুন, শুক্রবার ১৪২১ বঙ্গাব্দ ॥ ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ :

ঋতুরাজ বসন্তের প্রারম্ভে ফাউন্ডেশনের গ্রামীণ খেলার মাঠে বাসন্তী রাঙা শাড়িতে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশনায় গ্রামীণ খেলা পরিবেশিত হয়। জনাব মোঃ ওয়ালীউল্লাহ গ্রামীণ খেলা পরিচালনা করেন। এরপর শ্রী হিমাংশু কুমার মজুমদারের তত্ত্বাবধানে লোকজীবন প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। বৈকালিক লোকসঙ্গীতের আসরে শিল্পী আনিসা, হিরু ফকির, মফিজুল ইসলাম প্রমুখ শিল্পীদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ লোকসঙ্গীত পরিবেশিত হয়। উল্লেখ্য যে, যন্ত্রসঙ্গীতে এদিন সার্বিক সহযোগিতা করেন তবলায় রবি রায়, কিবোর্ডে এমএ আকাশ, প্যাডে রূপক, বাঁশিতে শুভ, ঢোলে রাজকুমার, হারমনিয়ামে মোখলেসুর রহমান প্রমুখ। দিনব্যাপী যেমন খুশি গ্রামীণ সাজো অনুষ্ঠানে ছিলেন সোলেমান এবং আবদুর রহমান। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশের স্বনামধন্য শিল্পী ইন্দ্রমোহন রাজবংশী ও

তার দল। বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

মাসব্যাপী লোককারুশিল্পমেলা সমাপ্ত

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ : বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের মাসব্যাপী লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৫ সমাপ্ত। বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতির আবাহন বসন্ত বরণ ও সর্বজনীন বিশ্ব ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড় ছিল। আজ বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে ফাউন্ডেশনের লোকজ মঞ্চে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মাসব্যাপী মেলার আয়োজনে ছিল আবহমান বাংলার লোকজীবনের লুপ্তপ্রায় দৃশ্যাবলীর প্রদর্শনী। সোনারগাঁ উপজেলার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশনায়-নুনতা, কানামাছি, রুমাল চুরি, গোল্লাছুট, ফুলটোক্কা খেলাসহ গ্রামীণ খেলাধুলা পরিবেশিত হয়।

মাসব্যাপী মেলা ও লোকজ উৎসব উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কারুশিল্পজাত পণ্যসামগ্রী বিক্রয়ের জন্য মেলা প্রাঙ্গণে হস্তশিল্প ৪৮টি, পোশাক ৪১টি, স্টেশনারি ও কসমেটিক্স ৩৬টি, খাবার ও চটপটি স্টল ১৯টি, মিষ্টির স্টল ১৬টিসহ মোট ১৭২টি স্টল ছিল।

এবার বিশেষ আকর্ষণে বান্দরবান, রাঙামাটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবন যাত্রার চালচিত্রসহ দেশের প্রথিতযশা ২৩ শ্রেণির ৪৬ জন কারুশিল্পীর কর্মময় পরিবেশের মাধ্যমে ২৩টি স্টলে তাঁদের পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের সৃজনশীল প্রদর্শনী উপস্থাপন করেন।

মাসব্যাপী লোকজ উৎসবের উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমালায় বাউল গান, পালাগান, ভাওয়াইয়া-ভাটিয়ালি, জারি-সারিগান, হাছন রাজার গান, লোকজ গীতি নৃত্যনাট্য, লালন সঙ্গীত, মাইজভান্ডারী, মুর্শিদী গান এবং আলকাপগান পরিবেশন করা হয়। এছাড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আইনি সহায়তা প্রদানে জেলা লিগ্যাল এইড এর বিশেষ সেবামূলক স্টল এর আয়োজন করা হয়।

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন : ০৯ ফাল্গুন শনিবার ১৪২১ বঙ্গাব্দ ॥ ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনে ভাষা শহীদ স্মরণে দিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে ফাউন্ডেশনের পরিচালক রবীন্দ্র গোপ-এর সভাপতিত্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্যে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করা হয়। অনুষ্ঠানে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও শিশুদের অঙ্কিত চিত্র প্রদর্শনীর বিশেষ আয়োজন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ টেলিভিশন নারায়ণগঞ্জের প্রতিনিধি একেএম মাহফুজুর রহমান, ফাউন্ডেশনের উপরিচালক মো. রবিউল ইসলাম প্রমুখ।

কবি আফরোজা কণার সার্বিক সঞ্চালনায় বঙ্গবন্ধু ভাস্কর্যের পাদদেশে লালন পাঠশালার ছোট্ট সোনামণিদের উপস্থাপনায় আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো গান পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি, লোকজ নৃত্য এবং শিল্পী নীলুফার লিলি, ওস্তাদ সোলায়মান ও পীযুষ ইসলামের কণ্ঠে ভাষার গান পরিবেশিত হয়। বিপুলসংখ্যক দর্শক অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৬তম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন ৩ চৈত্র, মঙ্গলবার ১৪২১ বঙ্গাব্দ ॥ ১৭ মার্চ ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ : বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৯৬তম গৌরজ্জ্বল জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে ফাউন্ডেশনের পরিচালক রবীন্দ্র গোপের সভাপতিত্বে বঙ্গবন্ধু'র ভাস্কর্যে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করেন নারায়ণগঞ্জ-৩ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব লিয়াকত হোসেন খোকা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার আবু নাছের ভূঁঞা, সোনারগাঁও উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এ্যাডভোকেট সামসুল ইসলাম ভূঁইয়া, সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান কালাম, উপজেলা পরিষদ, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সোনারগাঁ, যুবলীগ

স্বেচ্ছাসেবক লীগ, সোনারগাঁও পৌরসভা, প্রেস মিডিয়া, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট, সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটিসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

জাতির জনকের সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয় জাতিসত্তার প্রতীক বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন। বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশ ও প্রাচীন ঐতিহ্যকে রক্ষাকল্পে তাঁর জন্মদিবসের স্মরণীয় দিনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বৈচিত্র্যময় দই-এর হাঁড়ি, গুড়ের হাঁড়িসহ মৃৎশিল্পের তৈজপত্রের বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য যে, মাসব্যাপী এ প্রদর্শনীতে রাজশাহীর শখের হাঁড়ির শিল্পী শ্রী সুশান্ত কুমার পাল-এর কর্মময় পরিবেশ উপস্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বৈকালিক অনুষ্ঠানে সোনারগাঁ উপজেলার বিভিন্ন স্কুল, কিন্ডার গার্টেনের ছাত্র-ছাত্রী এবং লালন পাঠশালার ছোট্ট সোনামণিদের অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কন, বঙ্গবন্ধু'র ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, শিশুদের কবিতা আবৃত্তি, পুরস্কার বিতরণ ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশ বেতার-টেলিভিশনের স্বনামধন্য শিল্পী ওস্তাদ সোলাইমান, আনিসা, পীযুষ ইসলাম, আইনাল হক বাউল এবং লালন পাঠশালার ছোট্ট সোনামণিগণ।

অনুষ্ঠানটির সার্বিক সঞ্চালনায় ছিলেন কবি আফরোজা কণা। বিপুলসংখ্যক দর্শক বঙ্গবন্ধু'র গৌরবোজ্বল ৯৬তম জন্মোৎসবের বর্ণিল অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন :

১২ চৈত্র, বৃহস্পতিবার ১৪২১ বঙ্গাব্দ ॥ ২৬ মার্চ ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ, আজ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। বাঙালির শৃঙ্খল মুক্তির দিন। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের স্মরণে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে দু'দিনব্যাপী স্বাধীনতা উৎসবের শুভ উদ্বোধন করা হয়। এ উপলক্ষে ফাউন্ডেশনের পরিচালক রবীন্দ্র গোপের সভাপতিত্বে বঙ্গবন্ধু ভাস্কর্যে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করেন নারায়ণগঞ্জ-৩ আসনের মাননীয় সংসদ-সদস্য লিয়াকত হোসেন খোকা, সাবেক সংসদ-সদস্য আব্দুল্লাহ্-আল-কায়সার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার আবু নাছের ভূঁঞা, সোনারগাঁ উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এ্যাডভোকেট সামসুল ইসলাম ভূঁইয়া, সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান কালাম, উপজেলা পরিষদ, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, জেলা জাতীয় পার্টি, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, সোনারগাঁও পৌরসভা, প্রেস মিডিয়া, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট, সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু'র স্বাধীনতা ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধ শীর্ষক আলোচনা শেষে সোনারগাঁ উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডকে ফাউন্ডেশনের স্মারক ও ২৫ হাজার টাকার চেক প্রদান করা হয়। বৈকালিক অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু'র ভাস্কর্যের পাদদেশে চিত্রাঙ্কন এবং লোকগানের আসর বসে। এতে ওস্তাদ সোলায়মান, শিল্পী আনিসা, পীযুষ ইসলাম ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছোট্ট সোনামণিরা মনোজ্ঞ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। স্থানীয় নেতৃবৃন্দসহ বিপুলসংখ্যক দেশি-বিদেশি পর্যটক ফাউন্ডেশন আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

১৩ চৈত্র, শুক্রবার ১৪২১ বঙ্গাব্দ ॥ ২৭ মার্চ ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ : বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের স্মরণে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে দু'দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে ফাউন্ডেশনের পরিচালক রবীন্দ্র গোপের সভাপতিত্বে মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে সমাপনী দিবসের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। বৈকালিক অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু ভাস্কর্যের পাদদেশে ৭ মার্চের ভাষণ স্বকণ্ঠে আবৃত্তি, কবিতা আবৃত্তি ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ এবং লোকগানের আসর বসে।

কবি আফরোজা কণার সার্বিক সঞ্চালনায় ওস্তাদ সোলায়মান, শিল্পী রুবি সরকার, পীযূষ ইসলাম ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছোট্ট সোনামণিরা অনুষ্ঠানে মনোজ্ঞ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। বিপুলসংখ্যক দর্শক অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

১৫টি দেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূতগণের ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ি পরিদর্শন

শনিবার, ১৫ এপ্রিল ২০১৫ ॥ ১২ বৈশাখ ১৪২২, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের ঐতিহাসিক বড় সরদার বাড়ির রেস্টোরেশন কাজ পরিদর্শন করেন, ঢাকায় নিযুক্ত ১৫টি দেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূত ও তাঁদের স্পাউসগণ। অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন, কোরিয়া ইপিজেডের মাননীয় প্রেসিডেন্ট সাবেক রাষ্ট্রদূত মি. জাহাঙ্গীর সা'দাত। ফাউন্ডেশনের পরিচালক রবীন্দ্র গোপ সম্মানিত অতিথিগণের উদ্দেশ্যে স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রজাতন্ত্রী দক্ষিণ কোরিয়ার মান্যবর রাষ্ট্রদূত H.E. Mr. lee Yun-young, ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত H.E. Ms Sophie Aubert, ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত H.E. Ms Hanne Fugl Eskjaer, ইউরোপিয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত H.E. Mr Pierre Mayaudon, ইতালির রাষ্ট্রদূত H.E. Mr Mario Palma, ভূটানের রাষ্ট্রদূত H.E. Ms. Pema Choden মালয়েশিয়ার হাইকমিশনার H.E. Ms Norlin Othman কানাডিয়ান হাইকমিশনার H.E. Mr Benoit-Pierre Laramee রাশিয়ান ফেডারেশনের রাষ্ট্রদূত H.E. Mr Alexander A. Nikolaev মিশর প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রদূত H.E. Mr. Mahmoud Yehia Mohamed Ezzat Mostafa জাপান দূতাবাসের উপ মিশন প্রধান Mr. Takeshi Matsunaga সিঙ্গাপুরের কনস্যুলেট Mr. Daryl Lao, প্রজাতন্ত্রী কোরিয়ার কনস্যুলার Mr. Hyun-joo KIM, নেদারল্যান্ডের সিডিএ Mrs Martine van Hoogstraten, ইন্দোনেশিয়ার দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব Ms. Fitri Preganti এবং সাবেক মান্যবর রাষ্ট্রদূত জনাব ফারুক সোবহান চৌধুরী প্রমুখ।

উল্লেখ্য যে, কোরিয়া ভিত্তিক বহুজাতিক কম্পানি ইয়াংওয়ান ও কোরিয়া ইপিজেড এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মি. কিহাক সাং প্রায় ২০ লক্ষ ডলার ব্যয়ে ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ির প্রকৃত সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনতে রেস্টোরেশন কাজ পরিচালনা করছেন। মান্যবর অতিথি ও তাঁদের স্পাউসগণ রেস্টোরেশন কাজ পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এ উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানের লালন কর্ণারে এক মনোজ্ঞ লোকসঙ্গীতের আয়োজন করা হয়। এতে লোক সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী অনিমা মুক্তি গমেজ, আইনাল হক বাউল ও তার দল, রুবি সরকার ও তার দল, লালন পাঠশালার ছোট্ট সোনামণি সাঈদা ইসলাম প্রাপ্তি প্রমুখ।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৪তম জন্মবার্ষিকী পালন

২৫ বৈশাখ, শুক্রবার ১৪২২ বঙ্গাব্দ, ৮ মে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষসাধনের মহানায়ক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৪ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালায় কবিতা আবৃত্তি, নৃত্য ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। ফাউন্ডেশনের পরিচাক রবীন্দ্র গোপ-এর সভাপতিত্বে মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। এ উপলক্ষে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পল্লী উন্নয়ন ও রবীন্দ্রনাথ শীর্ষক আলোচনায় বক্তব্য রাখেন ভাষাসংগ্রামী বিশিষ্ট রবীন্দ্রগবেষক আহমদ রফিক। বিশেষ অতিথি ছিলেন কাজী নজরুল ইসলামের দৌহিত্র শিল্পী সুবর্ণ কাজী।

লালন পাঠশালার প্রশিক্ষক কাকলি সরকারের নির্দেশনায় অনুষ্ঠানে ছোট্ট সোনামনিদের নৃত্য পরিবেশিত হয়। রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী ড. অনুপম কুমার পাল, অনিমা মুক্তি গমেজ, আনিসা প্রমুখ অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানটির সার্বিক সঞ্চালনায় ছিলেন কবি আফরোজা কণা।

বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী এবং শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের মৃত্যুবার্ষিকী পালন

১৫ জৈষ্ঠ ১৪২২ বঙ্গাব্দ, ২৯ মে শুক্রবার ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রাঙ্গণে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৬তম জন্মজয়ন্তী এবং শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ৩৯তম

মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। এতে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিকৃতি ও শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ভাস্কর্যে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করা হয়। বৈকালিক অনুষ্ঠানে শিশুদের চিত্রাঙ্কন, স্বরণসভা, আলোচনা, কবিতা আবৃত্তি, নৃত্যানুষ্ঠান ও নজরুল সঙ্গীতের আসর আয়োজন করা হয়।

ফাউন্ডেশনের পরিচালক রবীন্দ্র গোপ এর সভাপতিত্বে মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যদিয়ে সাংস্কৃতিক উৎসবের শুভ উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের কণ্ঠসৈনিক মাজহারুল ইসলাম, বিশিষ্ট নজরুল সঙ্গীতশিল্পী ফাতেমাতুজজোহরা ও কাজী নজরুল ইসলামের দৌহিত্র সুবর্ণ কাজী। কবি আফরোজা কণার সার্বিক সঞ্চালনায় কবিতা আবৃত্তি, সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠানে লালন পাঠশালার ছোট্ট সোনামণিগণ, শিল্পী অনিমা মুক্তি গমেজ ও সুবর্ণ কাজীর পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূতসহ ৫ জন সংসদ-সদস্যের ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ি পরিদর্শন

বুধবার, ৩ জুন ২০১৫ ॥ ২০ জৈষ্ঠ্য ১৪২২ : প্রজাতন্ত্রী দক্ষিণ কোরিয়ার মান্যবর রাষ্ট্রদূত H.E. Mr. lee Yun-young-এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের ঐতিহাসিক বড় সরদার বাড়ির রেস্টোরেশন কাজ পরিদর্শন করেন দক্ষিণ কোরিয়ার নিম্নোক্ত ৫ জন মাননীয় সংসদ-সদস্য :

1. Mr. Chowon-Jin, Member ane Chairman of Korea-Bangladesh Paliamentary Friendship Group. National Assembly, Republic of Korea
2. Mr. Lim Neh-Hyun, Member, National Assembly, Republic of Korea
3. Ms. Kang Eun-Mi, Assistant Secretary, National Assembly Secretariat.
4. Mr. Hyun-joo Kim, Deputy Chief of Mission, Korean Embassy
5. Mr. Shamsul Alam, office, Korean Embassy।

অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন কোরিয়া ইপিজেডের মাননীয় প্রেসিডেন্ট সাবেক রাষ্ট্রদূত মি. জাহাঙ্গীর সা'দাত। ফাউন্ডেশনের পরিচালক রবীন্দ্র গোপ সম্মানিত অতিথিগণের উদ্দেশ্যে স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইন্ট্রাকো গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রজাতন্ত্রী দক্ষিণ কোরিয়ার আরারি কনস্যুল জনাব মোহাম্মদ রিয়াদ আলী, বড় সরদারবাড়ি রেস্টোরেশন প্রকল্পের পরিচালক বিশিষ্ট স্থপতি ড. আবু সাঈদ এম. আহমেদ প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, কোরিয়া ভিত্তিক বহুজাতিক কোম্পানি ইয়াংওয়ান ও কোরিয়া ইপিজেড এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মি. কিহাক সাং প্রায় ২০ লক্ষ ডলার ব্যয়ে ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ির প্রকৃত সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনতে রেস্টোরেশন কাজ পরিচালনা করছেন। অতিথিগণ রেস্টোরেশন কাজ পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

বার্ষিক অনুষ্ঠানসূচি

মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব আয়োজন	১৪ জানুয়ারি থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি (১ মাঘ - ২ ফাল্গুন)
শহীদ দিবস ও আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন	২১ ফেব্রুয়ারি (৯ ফাল্গুন)
বসন্ত বরণ উৎসব ও বিশ্ব ভালোবাসা দিবস উদ্‌যাপন	১৩-১৪ ফেব্রুয়ারি (১-২ ফাল্গুন)
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মোৎসব ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন	১৭ মার্চ (৩ চৈত্র)
মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন	২৬ মার্চ (১২ চৈত্র)

চৈত্রসংক্রান্তি, বৈশাখী মেলা ও বাংলা নববর্ষবরণ উৎসব উদ্‌যাপন	১৩-১৫ এপ্রিল (৩০ চৈত্র - ২ বৈশাখ)
বুদ্ধ পুর্ণিমা উদ্‌যাপন	০৩ মে (২০ বৈশাখ)
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন	০৮ মে (২৫ বৈশাখ)
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন	২৫ মে (১১ জ্যৈষ্ঠ)
শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের মৃত্যুবার্ষিকী পালন	২৮ মে (১৪ জ্যৈষ্ঠ)
মাছ ধরা ও বর্ষাবরণ উৎসব উদ্‌যাপন	১৫ জুন (১ আষাঢ়)
ঈদ আনন্দোৎসব (ঈদ-উল-ফিতর) উদ্‌যাপন	১৮ জুলাই (৩ শ্রাবণ)
জাতীয় শোক দিবস পালন	১৫ আগস্ট (৩১ ভাদ্র)
ঈদ আনন্দোৎসব (ঈদ-উল-আজহা) উদ্‌যাপন	২৫ সেপ্টেম্বর (১০ আশ্বিন)
শেখ রাসেল-এর জন্মোৎসব উদ্‌যাপন	১৮ অক্টোবর (৩ কার্তিক)
শারদীয় উৎসব উদ্‌যাপন	২৩ অক্টোবর (৮ কার্তিক)
মহান বিজয় উৎসব ও পৌষপার্বণ উদ্‌যাপন	১৬ ডিসেম্বর (২ পৌষ)
বড়দিন উৎসব উদ্‌যাপন	২৫ ডিসেম্বর (১১ পৌষ)
শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জন্মোৎসব উদ্‌যাপন	২৯ ডিসেম্বর (১৫ পৌষ)

এক নজরে বর্তমান সরকারের সময়ে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের উন্নয়ন প্রকল্প

১	প্রধান গেইট নির্মাণ
২	সীমানা প্রাচীর নির্মাণ
৩	পার্কিং ময়দান নির্মাণ
৪	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুউচ্চ ভাস্কর্য নির্মাণ
৫	শিল্পাচার্য জয়নুলের আবক্ষ ভাস্কর্য নির্মাণ
৬	শেখ রাসেলের ভাস্কর্য নির্মাণ
৭	জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর ও প্রশাসনিক ভবনের ঊর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ
৮	৩টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ
৯	৩টি কারুব্রিজ নির্মাণ
১০	অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ
১১	সোনারতরী মঞ্চ নির্মাণ
১২	অভ্যন্তরীণ আলোকিত করণ কাজ
১৩	কারুপল্লীতে ৪৮টি স্টল নির্মাণ
১৪	'বনছায়া' অফিসার্স কোয়ার্টরের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ
১৫	ছায়ানীড়' স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ
১৬	চতুর্থতলা স্টাফ কোয়ার্টার মেরামত ও সংস্কার
১৭	নামাজঘর , মন্দির মেরামত ও সংস্কার
১৮	বাঁশের সাঁকো তৈরি
১৯	জাদুঘরের আসবাবপত্র সংগ্রহ
২০	আবাসন এলাকার ভূমি উন্নয়ন
২১	লাইব্রেরিতে বই সংগ্রহ
২২	ডাকবাংলোর মেরামত ও সংস্কার কাজ
২৩	দক্ষিণ কোরিয়া'র ইয়াংওয়ান করপোরেশন কর্তৃক ফাউন্ডেশনের বড় সরদারবাড়ির রেস্টোরেশন কাজ
২৪	কারুশিল্পী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের মাসব্যাপী লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসব ১৯৯৮ এর শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মাসব্যাপী লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৫-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এমপি

ফাউন্ডেশনের ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ির রেস্টোরেশন কাজ পরিদর্শন করছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত ভারপ্রাপ্ত সচিব আক্তারী মমতাজ

ফাউন্ডেশনের মাসব্যাপী লোককারুশিমেলায় কর্মরত কারুশিল্পী প্রদর্শনীতে নকশি কাঁথা অবলোকন করছেন মাননীয় মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এমপি

ফাউন্ডেশনের ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ি পরিদর্শন করেন দক্ষিণ কোরিয়া'র গোয়াংজু ফ্রেন্ডশীপ এসোসিয়েশন এর ভাইস প্রেসিডেন্ট Ms Kim Ye Suk

মাসব্যাপী মৃৎশিল্প প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন ফাউন্ডেশনের পরিচালনা বোর্ডের সম্মানিত সদস্য শিল্পী হাশেম খান, চন্দ্রশেখর সাহা, মইনুদ্দীন খালেদ, নিসার হোসেন, এবং সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মো. মনজুরুর রহমান

ফাউন্ডেশনের সভাকক্ষে পরিচালানা বোর্ডের সভায় সভাপতির বক্তব্য রাখছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এমপি

শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর পরিদর্শন করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এমপি সঙ্গে আছেন শিল্পী হাশেম খান

ফাউন্ডেশনের পরিচালনা বোর্ডের ১১১তম সভায় উপস্থাপিত প্রস্তাব বাস্তবায়নে সহায়তা/পরামর্শ/সুপারিশ প্রদান সংক্রান্ত কমিটির সভায় সভাপতির বক্তব্য রাখছেন শিল্পী হাশেম খান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভীর নেতৃত্বে ঢাকায় নিযুক্ত ১৫টি দেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূত ও তাঁদের স্পাউসগণ ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ি পরিদর্শন করেন

ফাউন্ডেশনের বড় সরদারবাড়ির রেস্টোরেশন কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন ইয়াংওয়ান কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মি. কিহাক সাং, কেইপিজেডের প্রেসিডেন্ট মি. জাহাঙ্গীর সা'দাত ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

ফাউন্ডেশনের ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ির রেস্টোরেশন কাজ পরিদর্শন শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সাবেক রাষ্ট্রদূত ফারুক সোবহান চৌধুরী

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ভাষাসংগ্রামী, বিশিষ্ট রবীন্দ্রগবেষক আহমদ রফিক

চৈত্রসংক্রান্তি বৈশাখীমেলা উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন প্রফেসর এমেরিটাস আনিসুজ্জমান

মেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ভাষাসংগ্রামী কামাল লোহানী

ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ি পরিদর্শন করেন দক্ষিণ কোরিয়ার জাতীয় সংসদ-সদস্য Mr. Cho Won-Jin, Mr Lim Neh-Hyun, কোরিয়ার মান্যবর রাষ্ট্রদূত H.E.Mr.Lee Yun-Young সঙ্গে আছেন কেইপিজেডের প্রেসিডেন্ট মি. জাহাঙ্গীর সা'দাত

লোকজ উৎসব ২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথির বক্তব্য রাখেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত কবি অমৃত মাইতি

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মোৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে কবিতা আবৃত্তি করছেন কাজী নজরুল ইসলামের দৌহিত্র সুবর্ণ কাজী ও কবি আফরোজা কণা

ফাউন্ডেশন অঙ্গনে বৃক্ষ রোপন করছেন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাই কোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচারপতি ভবানী প্রসাদ সিংহ

মহান স্বাধীনতা উৎসব ও জাতীয় দিবসে সোনারগাঁও অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে অনুদানের চেক প্রদান করেন নারায়ণগঞ্জ ৩ আসনের সাবেক সাংসদ আব্দুল্লাহ্-আল-কায়সার

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ৩৯তম মৃত্যুবার্ষিকীতে ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে পুষ্পার্ঘ নিবেদন

জাতীয় শোক দিবসে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে পুষ্পার্ঘ নিবেদন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মোৎসব ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে পুষ্পার্ঘ নিবেদন

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে বিজয়ী শিল্পীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করছেন ফাউন্ডেশনের পরিচালক

বাংলা নববর্ষ ১৪২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ফাউন্ডেশন আয়োজিত মঙ্গল শোভাযাত্রা

ফাউন্ডেশনের মনোরম ঝিলের জলে নৌকাবিলাসে বর্ষবরণ উৎসব ১৪২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ব্যাতিক্রমধর্মী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলা নববর্ষের শুভ উদ্বোধন

বাংলা নববর্ষ ১৪২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঝিলের জলে স্থাপিত আনন্দধারা মঞ্চে নৃত্য পরিবেশন

ফাউন্ডেশন আয়োজিত মহান বিজয় উৎসব ও পৌষমেলা ২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ছোট্ট সোনামণিদের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মোৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে সঙ্গীত পরিবেশন করছেন বিশিষ্ট নজরুল সঙ্গীত শিল্পী ফাতেমাতুজজোহরা

ফাউন্ডেশন আয়োজিত ঈদ আনন্দোৎসবে লোকসঙ্গীত পরিবেশন করছেন শিল্পী গোলাপী

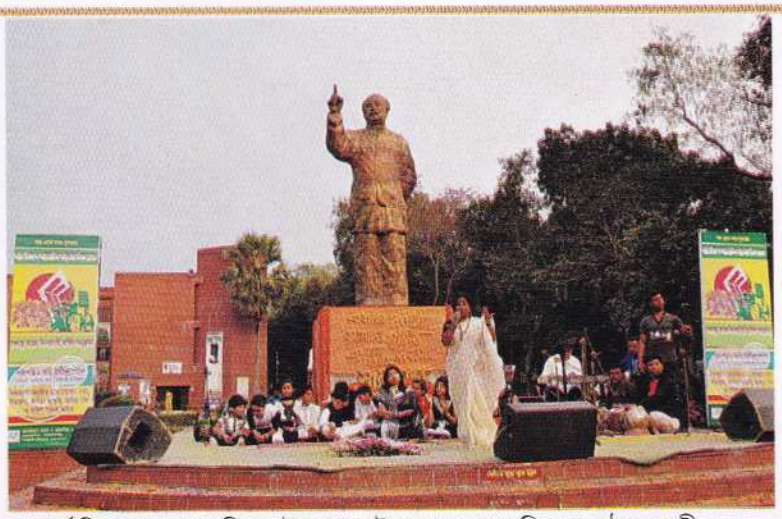

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করছেন শিল্পী নীলুফার লিলি

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে শিশুদের চিত্রাঙ্কন

মাসব্যাপী লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৫ উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে লোকসঙ্গীত পরিবেশন করছেন শিল্পী আনিসা

লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে লোকসঙ্গীত পরিবেশন করছেন শিল্পী কিরণ চন্দ্র রায়

লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে লোকসঙ্গীত পরিবেশন করছেন শিল্পী মধু

মাসব্যাপী লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৫ এর বিশেষ আয়োজনে অংশগ্রহণকারী কর্মরত কারুশিল্পীগণ

লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে লোকসঙ্গীত পরিবেশন করছেন আব্দুল কুদ্দুস বয়াতি

লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে লোকসঙ্গীত পরিবেশন করছেন শিল্পী অনিমা মুক্তি গমেজ

লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কিশোরগঞ্জের লোকজ গীতিনৃত্যনাট্য পরিবেশন

লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে লোকসঙ্গীত পরিবেশন করছেন শিল্পী ইন্দ্রমোহন রাজবংশী

লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পালাগান পরিবেশন করছেন সামসু দেওয়ান ও তার দল

লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে লোকসঙ্গীত পরিবেশন করছেন বাউলশিল্পী আলম দেওয়ান

মাসব্যাপী লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে লোকজীবন ভিত্তিক চিত্রকর্ম প্রদর্শনীতে 'কনে দেখার চালচিত্র'

লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৫ এর বিশেষ আয়োজন আর্টিজান এ্যাটওর্য়াক কর্মসূচিতে শোলার কারুশিল্পী নয়ন মালাকার

মাসব্যাপী লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত গ্রামীণখেলা প্রদর্শনীর একাংশ

ফাউন্ডেশনের ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ির রেস্টোরেশন কাজের বর্তমান চিত্র

ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ির পুকুর সংস্কার দৃশ্য

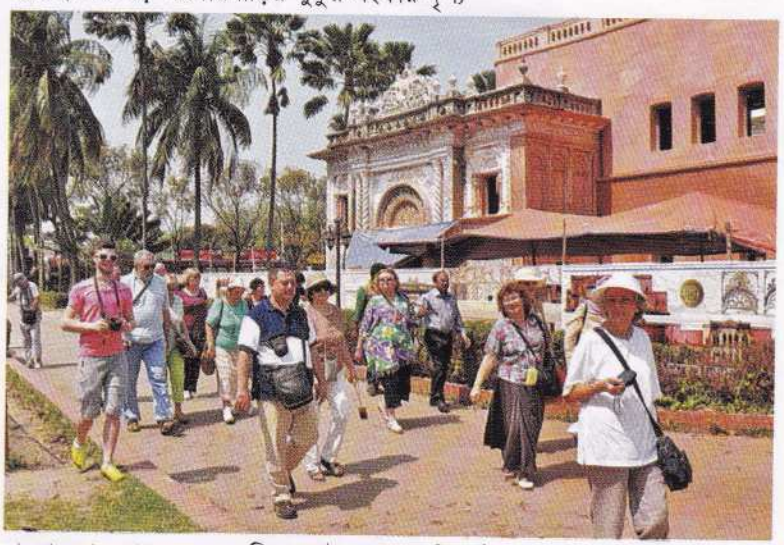

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন পরিদর্শনে আগত বিদেশি পর্যটকদের একাংশ